যাঁর কৃপা ও সহমর্মিতায় চিরায়ত-এর

সাহিত্য প্রকাশ সম্ভব হয়েছে

সেই দাদার শ্রীচরণে

গুলি খেয়ে জেরানগাউর মানুষ-খেকোটা যেভাবে পড়েছিলো
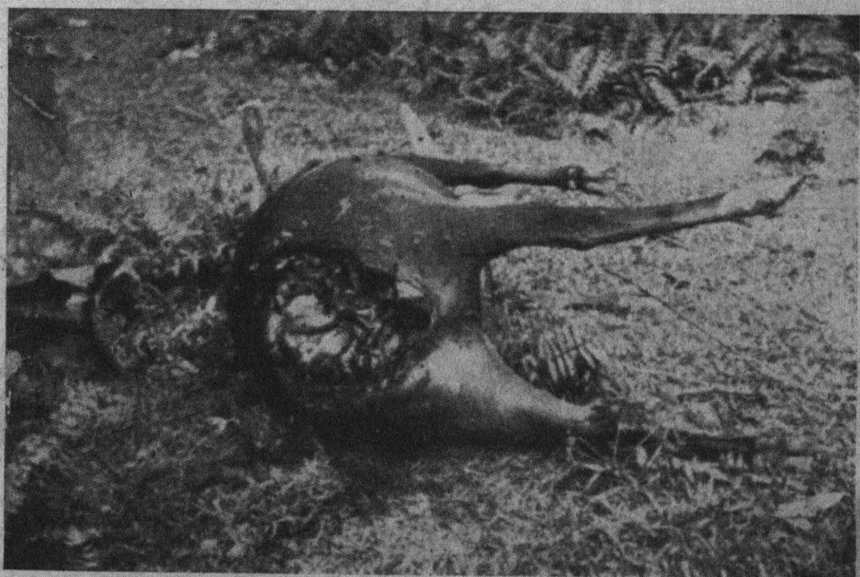
শিকার মারার পর বাঘ সাধারণত পেছন থেকে খেতে শুরু করে

মালয়ে থাকাকালীন আমি সবচেয়ে বড় যে বাঘটা মেরেছিলুম
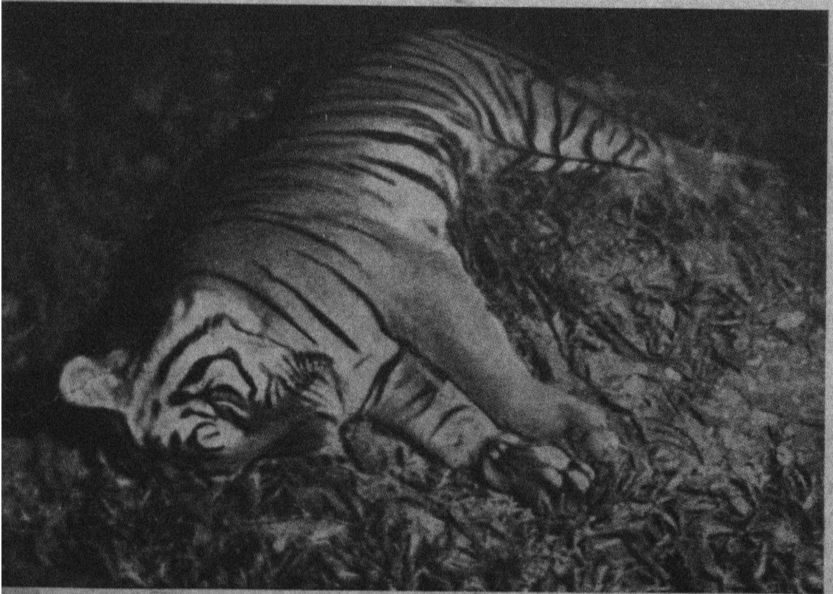
আমার জীবনে প্রথম বাঘ স্বীকার ॥ বাঘ নয়, নিতান্তই বাঘিনী

গুলি খাওয়ার পর কিজালের উত্তরী যমজ বাঘিনীর একটি

কেমাসেকের জীর্ণ শীর্ণ মানুষ-খেকোটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

মৃতের রক্ত-মাখা জামা-কাপড় দিয়ে বানানো নকল মানুষ

জেরানগাউির মানুষ-খেকো

১৯৪৯ সালের জানুয়ারিতে সরকারী প্রশাসন বিভাগের পদস্থ কর্মচারী হিসেবে আমাকে বদলি হয়ে আসতে হয়েছিলো কেমামানে। কেমামান আর ডুনগান, এই ছুটো জেলা নিয়ে ত্রেনগানু রাজ্যকে সম্প্রতি যুক্ত করা হয়েছে মালয়ের সাথে। আয়তনে ১৯৩৬ বর্গমাইল। মালয়বাসীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, তবু সামান্য কিছু সংখ্যক চীনা তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এখানে ওখানে। এক জেলা-দফতর থেকে আর এক জেলা-দফতরের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইল। সারাটা অঞ্চলে পথ মাত্র তিনটে। দক্ষিণে কুয়ানটান থেকে কেমামান, ডুনগান, রাজ্যের রাজধানী কুয়ালা ত্রেনগানু হয়ে পূর্ব উপকূল সড়ক সোজা চলে গেছে উত্তরে কোটা ভারু পর্যন্ত। পূর্ব উপকূলের এই প্রধান সড়ক থেকেই নেমেছে অন্য পথছুটো। একটা গেছে কেমামান থেকে আয়ার পুটে নামে একটা গ্রাম অব্দি, প্রায় উনিশ মাইল দীর্ঘ। অন্যটা বাঁ-হাতি কেমামানকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে গিয়ে শেষ হয়েছে ইবোকে। পরে ১৯৫১ সালে আমি যখন আবার কেমামান থেকে বদলি হয়ে যাই, সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্টদের অবাধ গতিবিধির জন্যে পুলিস ওই তিনটে পথকেই 'লাল' হিসেবে চিহ্নিত করে। অবশ্য যাত্রীসাধারণের পক্ষে আতঙ্কিত হবার তেমন কোন কারণই ছিলো না। জলপথে নৌকা, স্থলপথে জীপ, দ্বি-চক্রযান, এমন কি পায়ে হেঁটে ঘোরাফেরারও কোন বাধা ছিলো না।

কেমামানে দিন দিন যেভাবে বাঘের উপদ্রব বেড়ে চলেছে, আজ এর কাল ওর পরশু তার গরু ভেড়া ছাগল মেরে যেভাবে ত্রাসের রাজত্ব বাড়িয়ে চলেছে, পদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার সঙ্গে আমারও যে একটা নৈতিক দায়িত্ব জড়িয়ে রয়েছে, এখানে বদলি না হয়ে এলে আমি কোনদিনই তা উপলব্ধি করতে পারতুম না। গ্রামবাসীরা একেই

খুব গরীব, তার ওপর তাদের এই অসম্ভবরকমের ক্ষতি সত্যিই চোখে দেখা যায় না। আমার বাসা থেকে এক মাইলের মধ্যে একটা বাঘ সাত সপ্তায়ে তেইশটা গবাদি পশু মেরেছে। খতিয়ে দেখতে গেলে এই ক্ষতির পরিমাণ দৈনিক সাড়ে পাঁচ পাউণ্ড, এই অঞ্চলের মালয়বাসীরা যা গড়ে প্রায় পনেরো দিনে উপার্জন করতে পারে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার—মেরেছিস বাবা খা, তা নয়: যেখানে মেরেছে সেখানেই সম্পূর্ণ অক্ষত-অবস্থায় পশুটাকে ফেলে রেখে বাঘটা পালিয়েছে।

কতকগুলো বাঘ আবার তার চাইতে বেশি বাঁদরামি শুরু করেছে। আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় যে পথে কোন বাঘকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে, বাপ-মারা তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সে পথে কিছুতেই স্কুলে পাঠাতে চাইতো না। রবার-বাগিচার কর্মীদেরও বহুবার বাঘের মুখোমুখি পড়তে হয়েছে, যাওয়া-আসার পথে মাইলের পর মাইল তাদের নিঃশব্দে অনুসরণ করেছে, উৎকট ক্রুদ্ধ গর্জনে নিস্তব্ধ অরণ্যের বুক কাঁপিয়ে রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। বাঘের ভয়ে রাবার-বাগিচার কর্মীরা কাজেই আসতে চাইতো না, নয় তো কাজ ফাঁকি দিয়ে সবাই মিলে জটলা পাকাতো। এতেও দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ নিতান্ত কম নয়।

এখন এই বাঘের কবল থেকে ত্রাসের রাজত্বকে মুক্ত করা মুখে বলা যত সহজ, বাস্তবে পরিণত করা নিশ্চয়ই তত সহজ নয়। কেননা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনটে বিষয়ের ওপর আমাকে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে হয়েছিলো।

১. যতদিন না বাঘের গতিবিধি, তাদের স্বভাব-চরিত্র রীতি-নীতি সম্পর্কে আমি নিজে সম্পূর্ণ সচেতন হচ্ছি, কোন বাঘকে আমি গুলি করে হত্যা করতে চাই না, কেননা এর আগে আমি কখনও কোন বাঘকে গুলি করে মারিনি।

২. নিজের দফতরের কাজ নিয়েই এত ব্যস্ত রয়েছি যে ওদের ওপর নজর দেবার যথেষ্ট অবকাশই পাচ্ছি না।

৩. সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্টদের হাত থেকে আত্মরক্ষার নতুন কৌশল উদ্ভাবন না করতে পারা পর্যন্ত গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করা প্রায় দুঃসাধ্য।

প্রথম বাধাটা দূর করতে অবশ্য আমার খুব একটা অসুবিধে হয়নি। যখনই অবকাশ পেয়েছি প্রতিটা উপদ্রুত অঞ্চল আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। খুঁটিয়েখুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছি বাঘেদের স্বভাব-চরিত্র, কেমন করে ওরা শিকার মারে, মারার পর কত দূরে শিকারকে টেনে নিয়ে যায়। নিহত শিকারের সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বাঘ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে ওদের অমিত শক্তি, ওদের অদ্ভুত স্বভাব-চরিত্রের ব্যাপারগুলো খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে করতে আমি এমন বিমোহিত হয়ে যেতুম যে গুলি করে মারার কথা একবারও মনে আসতো না। পরে অবশ্য প্রয়োজনবোধে যে গুলি করে মারিনি এমন কোন কথা নয়।

বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামপ্রধান, বা 'পেজ্যুলু'দের নিয়েএকটা সুসংগঠিত শক্তি গড়ে তোলা হয়েছিলো, যারা কোথাও কোন পশু বা মানুষ নিহত হবার খবর পেলেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতো এবং বাঘের গতি-বিধির মোটামুটি একটা চিত্র তুলে ধরতো। সাধারণত এই যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা হতো ফোনের মাধ্যমে, কখনও স্থানীয় আরক্ষীবাহিনীর সাহায্যে, কখনও বা পেজ্যুলুরা নিজেই এসে ব্যক্তিগতভাবে এই সংবাদ পৌঁছে দিতো আমার কাছে।

আমি আমার সাধ্যমত ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করার চেষ্টা করতুম। আমার বাসা থেকে খুব কাছেই বিনজাই গ্রাম। সেখানকারএকদল তরুণ সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে নিজেদের জান-মান বাঁচাবার জন্যে সশস্ত্র আরক্ষী-বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলো। তাদের প্রত্যেককেই একটা করে সটগান দেওয়া হয়েছিলো। বিনজাই গ্রামের পেজ্যুলুকে বলেছিলুম এই তরুণদের থেকে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবককে আমার সঙ্গে দিতে। কেমা-মান থেকে বদলি হয়ে যাবার পর আমার হয়ে এরাই তাদের সম্পত্তির দায়িত্বভার তুলে নিয়েছিলো নিজেদের কাঁধে এবং অতন্দ্র প্রহরীর মতো দিনরাত সারা গ্রামটাকে পাহারা দিতো।

দুটো বিষয়ের ওপর আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলুম। প্রথমত—বাঘ সাধারণত মানুষের পক্ষে আদৌ বিপজ্জনক নয়। মানুষ-খেকোয় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত ওরা সাধারণত মানুষকে সযত্নে এড়িয়েই চলতে চায়, যেমন স্বাভাবিকভাবে মানুষ চায় ওদের এড়িয়ে চলতে। অথচ আমাদের একটা বিশ্রী ধারণা আছে বাঘ মানুষ দেখলেই মারে, কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। ছোট্ট একটা ঘটনা বলি—একদিন সন্ধ্যেবেলায় জলার ধারে নির্জন একটা ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে বাঘিনীর জন্যে অপেক্ষা করছি। জলাটা যে খুব বড় তা নয়; ওপারে খানিকটা ফাঁকা মাঠ, চারপাশেই ঝোপঝাড়, তার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামবাসীদের ছোট ছোট কুঁড়ে। গোধূলিবেলার রাঙা আলোয় বাচ্চারা সেই ফাঁকা মাঠটায় লুকো-চুরি খেলছে। আমি যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছি ওরা সে খবর জানেই না। ঘণ্টাখানেক ধরে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে যে যার ঘরে ফিরে যাবার ঠিক একটু পরেই বাঘিনী বাঁ পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে গত রাত্তিরে মারা গরুটা খেতে শুরু করলো। ঠিক সেই সময় আমি তাকে গুলি করে মেরেছিলুম। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট, সত্যি ভাবতেও অবাক লাগে, বাঘিনী সারাদিন ওই ঝোপের মধ্যেই লুকিয়ে ছিলো। কেননা আমার পরে এসে ঝোপের মধ্যে ঢুকলে নিশ্চয়ই আমার চোখে পড়তো, আর ইচ্ছে করলে ও অনায়াসেই যেকোন একটা বাচ্চাকে জখম করতে পারতো। না, সেরকম কোন চেষ্টাই ও করেনি। আসলে বাচ্চাদের আক্রমণ করার কোন প্রবণতাই ওর মাথায় ঢোকেনি।

দ্বিতীয়ত—সাড়ে তিন বছর আফ্রিকা আর ভারতবর্ষের নানান জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর পর আমার এই অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে দিয়েছে মালয়ের বাঘ এমন অসম্ভব রকমের চালাক আর ক্ষিপ্র যে তাদের অনু-শীলন করা খুব কঠিন, প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কোথাও কোন শব্দ বা হাঁক-ডাক না ছেড়ে ছায়ার মতো নিঃশব্দে চলাফেরা করে, বিশেষ

করে দিনের বেলায়, এমন কি ঘন জঙ্গলেও। ফলে বহু ক্ষেত্রে ধীর স্থির এবং অভিজ্ঞ শিকারীর পক্ষেও ধৈর্যচ্যুতির কারণ ঘটে। কেননা দীর্ঘদিন ধৈর্য ধরে নানান বিচ্ছিন্ন ঘটনা আর তথ্য, এমন কি সামান্যতম তথ্যও একত্রিত না করতে পারলে বাঘের স্বভাবচরিত্র রীতি-নীতি সম্পর্কে কিছুই জানা সম্ভব নয়। প্রতিটা উপদ্রুত অঞ্চলে একটা বাঘ কতগুলো করে জন্তু মেরেছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোথায় কখন তাকে দেখা গেছে তার নিয়মিত একটা হিসেব রেখেছি, পায়ের ছাপ আর রক্তের দাগ ধরে গভীর জঙ্গল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অনুসরণ করেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, গত তিন বছর ধরে এখানের এত অজস্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সত্ত্বেও, বাঘ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এমনই এক ধরনের অদ্ভুত বন্য পশু যে তাদের সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করতে আমি আজও কুণ্ঠা বোধ করি।

নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ না পাওয়া পর্যন্ত এবং তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে যাচাই করে না দেখা পর্যন্ত আমি কোন বাঘকে কখনও হত্যা করিনি, করা উচিতও নয়। কেননা প্রকৃতির রাজ্যে বন্য প্রাণীদের সমতার প্রশ্ন এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণত রাত্তিরে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ইলেকট্রিক টর্চ জ্বেলেই গুলি করেছি। নইলে মালয়ের বাঘ এমন অসম্ভব রকমের চালাক যে মানুষ-খেকোয় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত দিনের বেলায় ওদের ধারে-কাছে ঘেঁষাই মুস্কিল। অনেকে হয়তো আলো জ্বেলে রাত্তিরে গুলি করে মারা আমার এই অশিকার-জনোচিত পদ্ধতিকে সমালোচনার চোখেই দেখবেন। কিন্তু মালয় উপদ্বীপের এদিকটায় একেই এমন ঘন জঙ্গল, বসবাসকারী গ্রামের এত কাছাকাছি আর সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্ট-অধ্যুষিত অঞ্চল এমনই দুর্গম যে জঙ্গলের মধ্যে নিহত পশুর কাছাকাছি মাচা বেঁধে রাতের অন্ধকারে গুলি করে না মারলে কোন বাঘকে ঘায়েল করা সত্যিই অসম্ভব। তবে প্রতিটা ক্ষেত্রেই নিহত বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে আমি গভীর মর্মবেদনা পেয়েছি, দুঃসহ যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা আমার মুচড়ে উঠেছে। প্রতিবারেই আমার মনে হয়েছে এমন দুঃসাহসী এমন অমিত শক্তিশালী রাজকীয় পদচারণরত বন্য জীবনের এমন দুর্লভ সুন্দর একটা প্রতীককে আমি নিজে হাতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি।

বাঘ সেই একই বর্ণোজ্জ্বল আশ্চর্য সুন্দর পশু, তা সে মালয়, ভারতবর্ষ কিংবা এশিয়ার অন্যান্য যে কোন অঞ্চলেই পাওয়া যাক না কেন। সুদূর উত্তরের আমুর নদী-অববাহিকা থেকে শুরু করে, সিনো-রাশিয়ার সীমান্ত ছুঁয়ে দক্ষিণের বালিদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাঘ পাওয়া যায়, পূবের সাখালিন দ্বীপে, সাইবেরিয়ার উপকূলে, পশ্চিমে মধ্য-রাশিয়ার তুর্কী জর্জিয়ায়। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, সিংহলে যথেষ্ট সংখ্যায় চিতা পাওয়া গেলেও বাঘ পাওয়া যায় না। ঠিক এমনি আর একটা দ্বীপ বোর্নিও যেখানে বাঘ পাওয়া যায় না। এদিক থেকে চেহারা, শক্তি আর সৌন্দর্যে ভারতীয় বাঘের খ্যাতি আবার সবার ওপরে।

সিঙ্গাপুর এবং পেনাং ছাড়া মালয়ের প্রায় সর্বত্রই বাঘ পাওয়া যায়, ত্রেনগানু, কেলানটান, পাহাং এবং পেরাকে তো বটেই। যুদ্ধের সময়ে জাপানী অবরোধের আগে পর্যন্ত জোহোরেও যথেষ্ট পরিমাণে বাঘ পাওয়া যেতো। আমার মনে আছে ১৯৫০ সালে সংবাদপত্রে একবার খবর বেরিয়েছিলো—সিঙ্গাপুরের সমুদ্র-সৈকতে নাকি বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেছে, এবং সেই ছাপ জোহোর-প্রণালী পর্যন্ত গিয়ে সংকীর্ণ জলরেখা অতিক্রম করে অন্য পারের দিকে চলে গেছে। সম্ভবত পেশীর জড়তা ছাড়িয়ে নেবার জন্যেই তার একটু সাঁতার কাটার শখ হয়েছিলো। কোন দুঃসাহসী বাঘের এই হঠকারিতায় সেদিন সিঙ্গাপুরে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিলো। অথচ কিছুদিন আগেও সিঙ্গাপুর বন্দরের নামকরা একটা হোটেলের বিলিয়ার্ড-ঘর থেকে যখন একজনকে বাঘে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো, তখন কেউ বিস্মিত হয়নি। যেমন আজকে দিনে কলকাতার উন্মুক্ত রাজপথে কোন বাঘকে দেখলে সবাই বিস্মিত হবেন, অথচ যেদিন কলকাতা ছিলো সুন্দরবনেরই গহন গভীরে, সেদিন কেউ বিস্মিত হতেন না, বরং তাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতেন।

একবার আমাকে সম্ভবত ঠাট্টা করেই বলা হয়েছিলো মালয়ে কত বাঘ আছে হিসেব করে বলতে পারেন। আমি বলেছিলুম বছরখানেক ছুটি পেলে, যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আর অবাধে সর্বত্র যাওয়া-আসার অনুমতি পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি, তবে যদি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মেলে। কেমামানে বছর দুই কাটানোর পর একদিন সন্ধ্যেবেলায় সত্যিই আমি কাগজ পেনসিল নিয়ে বসেছিলুম, সম্পূর্ণ নিজেরই ইচ্ছেয় সময় কাটানোর জন্যে। তাতে মোট বাঘের যে হিসেব পেয়েছিলুম, সত্যিই চমকে ওঠার মতো। নিচে সেই তালিকাটা যথাযথ তুলে দিলুম।

অঞ্চল	বর্গমাইল	বাঘের সংখ্যা
ত্রেনগান্নু	৫০৫০	৪৫০
কেলানটান	৫৭৪৬	৫০০
পাহাং	১৩৮৭৩	১১০০
পেরাক	৭৮৯০	৪০০
জোহোর	৭৩২১	৩০০
কেদা	৩৬৬০	১৫০
পার্লিস	৩১০	২০
সেলানগোর	৩১৬৬	৩০
উত্তর সেম্বিলান	২৫৫০	৩০
মালাক্কা	৬৩৩	১০
পেনাং	৪০০	০
	মোট ৫০৫৯৯	২৯৯০

একমাত্র কেমামানেই	বর্গমাইল	বাঘের সংখ্যা
বিনজাই	৪০·৮	৫
চুকাই	১১·৩	১
কেমাসেক	২৪·০	৩
কেরতে	৯১·৬	৭
কিজাল	২৩·৯	৩
পাসির সেমুত	২২·৬	৩
তেলোক কালোং	১৪·৭	২
উলু চুকাই	৯৫·৫	৮
	মোট ৩২৪·৪	৩২

যদিও আমার এই সংখ্যার হিসেব সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক এবং আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, তবু একটা কথা মোটামুটিভাবে বলা যায়—গড়ে প্রতিটা বাঘের অবাধ বিচরণের জন্যে দশবর্গ মাইল অঞ্চল মোটেই কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাপ নয়, ভারতবর্ষে তো নয়ই।

পুরনো দিনের অনেক শিকার-কাহিনীতে উল্লেখ পাওয়া যায় এক একটা বাঘ তেরো ফুট লম্বা, কিন্তু আজকের দিনে দুটো খোঁটার মধ্যবর্তী স্থানের মাপটুকু ভালো করে নিলে দেখা যাবে তা দশ ফুটের চেয়ে একটুও বেশি নয়। তাও আবার এই দশ ফুট বাঘ ভারতবর্ষের বাঘের তুলনায় যথেষ্ট বড়ই বলতে হবে।

১৯২৮ সালে প্রকাশিত বার্কের লেখা 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড শিকার বুক' বা ভারতীয় শিকার পর্যবেক্ষক নথিপত্রে সবচেয়ে বড় বাঘের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে. তার পরিমাপ দশ ফুট ন ইঞ্চি। দশ ফুট বা তার চেয়ে কিছু বড় বাঘ তো আছেই, আট ফুট সাড়ে এগারো ইঞ্চির বাঘকেও বড় বাঘের তালিকায় নেওয়া হয়েছে। অন্য দুটো বাঘের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটা ন ফুট ন ইঞ্চির একটা বাঘিনী, অন্যটা ন ফুট সাত ইঞ্চির একটা 'দুধ'-দাঁতের বাচ্ছা। অর্থাৎ এই যদি ভারত-বর্ষেরই বাঘের চিত্র হয়, তাহলে সে তুলনায় মালয়ের বাঘের দৈর্ঘ্য কত হতে পারে আশা করি কারুরই অনুমান করে নিতে কোন অসুবিধে হবে না।

আসলে আমাদের মাপ নেওয়ার পদ্ধতিটাই ঠিক নয়। মৃত বাঘকে এক পাশে লম্বা করে শুইয়ে দেহের ওপর দিয়ে ফিতের সাহায্যে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত 'ওভার কার্ভস' পদ্ধতিতে মাপলে খাঁজখোঁজ, উঁচুনিচু মাংসপেশীর জন্যে মাপের তারতম্য হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এদিক থেকে সমান্তরাল ভূমির ওপর মৃত বাঘের নাকের ঠিক সামনে একটা খোঁটা আর লেজের শেষ প্রান্তে অন্য আর একটা খোঁটা পুঁতে ইস্পাতের

ফিতের সাহায্যে এই 'মধ্যবর্তী দুই কীলক' বা 'বিটুইন পেগস্'-এর মাপ নেওয়ার পদ্ধতিটাকে আমি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি। কেননা ভরা বা খালি পেট, উঁচু নিচু মাংসপেশীর সংকোচন বা প্রসারণের ফলে যে ভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে, এতে তার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই গ্রন্থে যতগুলো মালয়ী বাঘের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সব-কটাই এই 'মধ্যবর্তী দুই কীলক'-এর মাপে নেওয়া।

এ কথা খুবই সত্যি, শুধু যে সংখ্যায় সুপ্রচুর তাই-ই নয়, মালয়ের তুলনায় ভারতবর্ষের বাঘ বা চিতার দৈর্ঘ্য ঢের বড়। তবু ভারতবর্ষের ওপর নানান পুঁথি-পত্রে বাঘের মাপের যে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তা সব-সময় আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। বারো ফুট বাঘের উল্লেখও আমি বিভিন্ন জায়গায় পেয়েছি। ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলার জন্যে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। বন্য পশু, বিশেষ করে বাঘ সম্পর্কে সুঅভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং প্রখ্যাত শিকারী জিম করবেট তাঁর 'কুমায়ুনের মানুষ-খেকো বাঘ'-এর কাহিনী প্রসঙ্গে 'পাওয়ালগড়ের কুমার-বাঘ' নামে যে অতিকায় পশুরাজের কথা উল্লেখ করেছেন, তাকে মারার জন্যে বহু শিকারী বছরের পর বছর হন্যে হয়ে ঘুরেছিলেন, নিঃসন্দেহে সেটা ছিলো ভারতীয় বাঘের দৈর্ঘ্যের তালিকার প্রায় শিরোভাগে। তবু তার দৈর্ঘ্য বারো-তেরো ফুট নয়। একজন শিকারী মেপে দেখেছিলেন দশ ফুট ছ ইঞ্চি, অন্য আর একজন শিকারী মেপে দেখেছিলেন দশ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। পরে জিম করবেট আর তাঁর বোন মৃত বাঘটার গায়ের ওপর দিয়ে ফিতে মেপে দেখেছিলেন দশ ফুট সাত ইঞ্চি। মধ্যবর্তী 'দুই কীলক'-এর পদ্ধতিতে মাপলে এই বিপত্তি তো হতোই না, বরং দেখা যেতো বাঘটার প্রকৃত দৈর্ঘ্য হয়তো দশ ফুট দু-তিন ইঞ্চি।

ভারতীয় অন্য বড় বাঘ তো দূরের কথা পাওয়ালগড়ের কুমার-বাঘের তুলনায়ও মালয়ী বাঘকে বলা যায় নিতান্তই শিশু। জোহোর বারুর রাজপ্রাসাদের জাদুঘরে সংরক্ষিত পঁয়ত্রিশটি মালয়ী বাঘের মধ্যে সব চেয়ে বড় বাঘের দৈর্ঘ্য ন ফুট আট ইঞ্চি। এটি মেরেছিলেন জোহোর বারুর সুলতান নিজে। দ্বিতীয় বাঘটির দৈর্ঘ্য ন ফুট ছ ইঞ্চি, মেরেছিলেন

শিকার-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জি. আর. লিওনার্দ। মালয়ে বাস করার সময়ে আমি সবচেয়ে যে বড় বাঘটা মেরেছিলুম তার দৈর্ঘ্য আট ফুট এগারো ইঞ্চি, গড়ে মালয়ী বাঘের তুলনায় তা যথেষ্ট বড়ই বলতে হবে।

বার্কের উদ্ধৃতি অনুযায়ী গড়ে ভারতবর্ষে বাঘের দৈর্ঘ্য ন ফুট ছ ইঞ্চি, বাঘিনীর দৈর্ঘ্য আট ফুট তিন ইঞ্চি থেকে আট ফুট ন ইঞ্চি, এবং দুর্লভ জাতের কিছু বাঘিনী গড়ে ন ফুট পর্যন্তও হতে পারে। ১৮৯৮ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত মহামান্য সুলতানের মারা মালয়ী বাঘের দৈর্ঘ্য গড়ে আট ফুট ছ ইঞ্চি, বাঘিনী সাত ফুট দশ ইঞ্চি।

বাঘের মতো চিতার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের তুলনায় মালয়ী চিতার দৈর্ঘ্যের এই তারতম্যও স্পষ্ট চোখে পড়ে। ভারতীয় চিতার দৈর্ঘ্য সাধারণত ছ ফুট থেকে সাড়ে সাত ফুট। কিন্তু মালয়ে আমি সবচেয়ে যে বড় কালো চিতাটা মেরেছিলুম তার দৈর্ঘ্য ছ ফুট দু ইঞ্চি। ভারতবর্ষের তুলনায় মালয়ে চিতার সংখ্যা অত্যন্ত কম, এবং ফুট ফুট দেওয়া চিতা মালয়ে প্রায় পাওয়া যায় না বললেই চলে। কিন্তু কম হলেও মালয়ে যা পাওয়া যায় তা হলো কালো চিতা, অন্য দেশে যা আবার দুর্লভ। জিম করবেট ফুট ফুট ছাপ-ওয়ালা হলদে একজোড়া ভারতীয় চিতার কথা উল্লেখ করেছেন, যারা পাঁচশোরও বেশি মানুষ মেরেছিলো। দুর্ভাগ্যবশত আমার সময়ে এমন কোন ঘটনা না ঘটলেও, মালয়ে মানুষ-খেকো চিতার যে কোন অস্তিত্ব ছিলো না এমন কথাও ঠিক নয়। তবে এ ঘটনা এমনই বিরল যে তার সম্পর্কে নতুন করে কিছু না বলাই ভালো। এমন কি ওরা গরু-ছাগলও বড় একটা মারে না, সাধারণত গভীর জঙ্গলে থাকতেই বেশি ভালোবাসে। শুনেছি চিতারা নাকি বাঘের চেয়ে আরও বেশি চতুর, আরও বেশি নিঃশব্দ পায়ে চলাফেরা করে। লিওনার্দের মুখে শুনেছি ভারতবর্ষের মতো মালয়ের চিতারা নাকি আদৌ কোন সাড়াশব্দ বা হাঁকডাক ছাড়ে না। আসলে মালয়ে চিতার সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের তেমন কোন অবকাশই হয়নি, যেমন অবকাশ পাইনি দাঁড়ি-পাল্লার অভাবে কোন বাঘকে গুলি করে মারার পর তাকে ওজন করে দেখার।

বাঘের চেয়ে বাঘিনীকেই দেখতে অনেক বেশি সুন্দর। বাঘের তুলনায় ওদের মাথা একটু সরু, সামনের থাবা ছটোও সামান্য একটু ছোট, মুখের চারপাশে চিবুকে পরিণত বাঘের মতো বড় বড় লোম থাকে না। ফলে শত্রুর মুখোমুখি হলে কোন বাঘকে যতটা ভয়ঙ্কর দেখায়, কোন বাঘিনীকে ঠিক ততটা দেখায় না।

আর রঙ, এক এক দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। উত্তর চীন বা সাইবেরিয়ার মতো শীতপ্রধান অঞ্চলের তুলনায় ভারতবর্ষ, দক্ষিণ এশিয়া এবং মালয় উপদ্বীপের মতো উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের বাঘের গায়ের রঙ অনেক বেশি উজ্জ্বল, মসৃণ আর ঘন ডোরা-কাটা। এদিক থেকে মালয়ের বাঘকে ভারতবর্ষের বাঘের মাসতুতো ভাইই বলা চলে। বরং অত্যুক্তি না হলে বলা যায়, গড়ে ভারতবর্ষের বাঘের তুলনায় মালয়ের বাঘকে অনেক বেশি সুন্দর দেখতে।

মাথার ওপরের অংশ, সারা দেহ, এমন কি লেজও ঘন পিঙ্গল বর্ণের। অবশ্য বিভিন্ন বয়েস এবং নানান পারিপার্শ্বিকতায় এই রঙের কিছু তারতম্য ঘটতে পারে। পেটের নিচে, গলার কাছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভেতরের অংশের রঙ প্রায় সাদা। চোখের চারপাশের রঙ হালকা-ধূসর, কানের পেছনছটো কালো। লেজে এক গোছা ঝাঁকড়া কালো চুল। সারা দেহে আর পেছনের পায়ে প্রায় কুচকুচে কালো ডোরা-কাটা দাগ। সামনের পায়ের বাইরের দিকে এই ডোরা-কাটা দাগ প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। ডোরা-কাটা দাগের এই নিপুণ কারুকার্য আবার সব বাঘের সমান নয়, এমন কি একই বাঘের দুপাশের ডোরা-কাটা দাগও সমানভাবে সুবিন্যস্ত নয়। কালো বা সাদা বাঘের কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু উভয় শ্রেণীর বাঘ প্রায় দুষ্প্রাপ্য বললেই চলে।

অনেক দিক থেকে বেড়ালের সঙ্গে বাঘের আচরণের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ওরাও ঠিক একই ভাবে দীর্ঘ জিভ দিয়ে চেটে নিজেদের পরি-

ষ্কার করে, একই ভাবে পেছনের পা মুড়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে, একই ভঙ্গিতে শুয়ে থাকে। বেড়ালছানার মতো বাঘের বাচ্ছারাও একই ভঙ্গিতে মায়ের সঙ্গে খেলা করে। বাঘের হাঁটা চলা, ঘোরা ফেরা, শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার রীতিও ঠিক বেড়ালের মতো, শুধু যা কেবল বেড়ালের মতো গরগরর শব্দ করে না। তাও অনেক সময় বাঘের বাচ্ছাদের খুশিতে বা আনন্দে অনেকটা ওই রকম শব্দ করতে শোনা যায়। মাঝে মাঝে, সাময়িক ভাবে যখন কোন সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে, পরিণত বাঘের লেজের নিচের গ্রন্থি থেকে এক ধরণের উগ্র-গন্ধ রস বা লালা নিঃসৃত হয়। তখন এই উদ্দেশ্যে বাঘ যে জায়গাটাকে বেছে নেয়, গন্ধেই সেখানটা স্পষ্ট চেনা যায়। কখনও ওদের দেহনিঃসৃত লালা চারপাশের ঘাস পাতা, নিচু নিচু ঝোপঝাড়েও লেগে থাকতে দেখা যায়।

অধিকাংশ সময়ে বাঘের মুখে এমন একটা অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, দেখলেই মনে হয়—হয় খুব বিরক্ত হয়ে রয়েছে, নয়তো দারুণ উদ্বিগ্ন বোধ করছে। যখন হাঁটে সাধারণত মাথাটা একটু ঝুঁকে থাকে, মৃদু দোলে, গরমে চোয়ালদুটো হাঁ হয়ে থাকে। পেছনের পাদুটো হাঁটুর কাছ থেকে যেন বড্ড বেশি ভাঁজ-খাওয়া, এবং পেছন থেকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় এমন সুন্দর একটা প্রাণীর তুলনায় পেছনের পাদুটো খুবই ছোট। স্বাভাবিক ভাবে চলার সময় লেজটা অনেকটা সরল কোণের ভঙ্গিতে তোলা থাকে, বাঁকানো থাকে লেজের শেষ প্রান্তটা। যখন নিশ্চল ভঙ্গিতে শুয়ে থাকে তখনও মাঝে মাঝে কানের পাতাদুটো মৃদু নাড়ায়।

বাঘ যখন ডাকে মনে হয় পেটের ভেতর থেকে অত্যন্ত জোরালো শক্তিশালী একটা শব্দ যেন প্রচণ্ড বেগে উঠে আসছে। বিভিন্ন সময়ের মেজাজের ওপর ওদের এই গর্জন নির্ভর করে। সাধারণত বাঘের ডাক অত্যন্ত ভরাট আর জোরালো মনে হলেও কেমন যেন একটু ধরা-ধরা গোছের আর ঘড়ঘড়ে, কখনও কখনও তা দীর্ঘস্থায়ী চাপা আর্তনাদের মতোও মনে হতে পারে। খুব কম সময়েই শোনা যায় অহেতুক অসন্তোষে ভরা ওদের অস্পষ্ট গলার আওয়াজ। সঙ্গিনীর প্রয়োজনে কোন বাঘ, কিংবা হারিয়ে-যাওয়া বাচ্ছার খোঁজে কোন বাঘিনী যখন ক্রুদ্ধ গর্জন করে, সে

ডাক ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে পরিপূর্ণ-কণ্ঠে সে উদাত্ত রাজকীয় গর্জন ছড়িয়ে পড়ে প্রান্ত থেকে প্রান্তলীন অরণ্যের গহন গভীরে। দু হাঁকের মাঝে খুব অল্পক্ষণের জন্য হলেও স্পষ্ট একটা বিরতি থাকে, তারপরেই তা চাপা বিস্ফোরণের মতো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যতটা সম্ভব খুব কাছাকাছি একটা উচ্চারণ দেবার চেষ্টা করলুম —'উউঁউঁউঁউঁম্ফ্-আঁআঁয়্যাঃ।

অন্যান্য বন্য প্রাণীর মতো বাঘকে কোন মতেই নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে বিশ্লেষণ করা যায় না। তবু স্বভাবের দিকে থেকে মালয়ের বাঘকে সাধারণত দু ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, যারা লোকবসতির আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, সাধারণত রাত্তিরেই ঘরের পোষা জীবজন্তু মারে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর যারা সাধারণত জঙ্গলের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখে, দিনে কিংবা রাতে সুযোগ পেলেই বনের জীবজন্তু মারে। খিদের জ্বালায় প্রথম উক্ত শ্রেণীর বাঘ লোকবসতির আশেপাশে প্রকাশ্য দিবালোকে যে শিকার মারে না, এমন ঘটনা কিন্তু আদৌ বিরল নয়। আর এরকম কোন ঘটনা ঘটলেই বাঘ সাধারণত মৃত পশুটাকে কিছু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে নিভৃত একটা জায়গায় রেখে দিয়ে আসে, যাতে রাতের অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথেই সে মৃত পশুটাকে খেতে পারে।

ত্রেনগানুর বিভিন্ন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার সময় আশেপাশে গ্রামের অনেককেই আমি বলতে শুনেছি রাতের চেয়ে দিনের বেলাতেই নাকি তাদের শুয়োর গরু ছাগল ভেড়া বেশি মারা পড়েছে। খুব স্বাভাবিক, জঙ্গলের কাছাকাছি খুব দূরে দূরে ছড়ানো ছিটনো সব ঘর, সারা দিন তাদের গরু বাছুর সব ছাড়াই থাকে মাঠে মাঠে। তার মধ্যে থেকে দু-এক টাকে টেনে নিয়ে যাওয়া বাঘের পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। এমন কি আমি এ-ও শুনেছি—ভোরবেলায় পশুর পাল যখন দল বেঁধে মাঠে যায়, কিংবা সন্ধ্যেবেলায় পশুর পাল যখন দল বেঁধে ঘরে ফিরে আসে, অসহ্য খিদের

জ্বালায়, কিংবা নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে এমন দুঃসাহসী কোন বাঘ সেই পশুর পালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটাকে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু সমুদ্রের আশেপাশে বিশেষ করে কেমাসেক আর দুনগানের গ্রামগুলোতে, যেখানে সৈকতের উষর বালিতে ঘাস প্রায় জন্মায় না, যেখানে লোকচলাচলের প্রধান সড়কের ধারের ধানক্ষেত ছাড়া অন্যকোন চারণভূমি নেই, সেখানে রাত্তিরে খোঁয়াড়ে ঢুকে গরু ছাগল মারা ছাড়া বাঘের অন্যকোন উপায় থাকে না।

আর বন্যপ্রাণীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বাঁচে এমন কেবল একটা মাত্র বাঘকেই আমি গুলি করে মারতে পেরেছিলুম, যে হঠাৎ করেই মানুষ-খেকোয় পরিণত হয়ে দিনের বেলাতেও অবাধে ঘুরে বেড়াতো। আসলে সন্ত্রাসবাদীদের জন্যে আপতকালীন জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকায় আমি গভীর জঙ্গলে গিয়ে এই শ্রেণীর 'আভ্যন্তরীণ' বাঘ সম্পর্কে তেমন কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারিনি। না, ঠিক নিষেধাজ্ঞার জন্যে নয়, বরং আরও স্পষ্ট করে বলতে পারি—নিজের জীবন বিপন্ন করে কমিউ-নিস্ট অধ্যুষিত নিবিড় অরণ্যে একা একা ঘুরে বেড়াতে আমি ঠিক সাহস পাইনি। না হলে সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারতুম—লোকবসতির আশেপাশে হানা-দিয়ে-ফেরা বাঘের চেয়ে এইসব আভ্যন্তরীণ বাঘদের সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো ঢের বেশি সহজ। আর এরা যখন কারুর কোন ক্ষতি করছে না, বরং প্রকৃতির ভারসমতা বজায় রাখার অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে চলেছে, তখন অহেতুক কারণে এদের গুলি করে মারার কোন প্রশ্নই আসে না। ঘন অরণ্যানীর গহন গভীরে এমন দুর্লভ সুন্দর পশুদের আপন খেয়ালখুশিতে ঘুরে বেড়াতে দেখার সৌভাগ্য আমার বড় একটা হয়নি।

একটা জিনিস আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি, মালয়ে যে কবছর ছিলুম তার মধ্যে আমি যতগুলো বাঘ মেরেছি, প্রায় অধিকাংশই মেরেছি খরার সময়ে, অর্থাৎ জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এ সময়ে সাধারণ ঘাস শুকিয়ে যায়, বিস্তীর্ণ বালির সমুদ্র-সৈকত ছেড়ে বুনো শুয়োর, সম্বর, হরিণের পাল সব চলে যায় গভীর জঙ্গলে। কিন্তু নভেম্বর থেকে মার্চের

মধ্যে বন্য প্রাণীরা আবার ফিরে আসে। তখন বাঘেদের গ্রামের আশে-পাশে হানা দেবার তেমন করে কোন প্রয়োজন থাকে না। এই সময়ের মধ্যে, বিশেষ করে আবার ফেব্রুয়ারি কিংবা মার্চে কোন বাঘকে গুলি করে মারা তো দূরের কথা, ওদের টিকিও আমি দেখিনি। আসলে এটা তখন তাদের প্রজননের সময়।

মালয়ে সাধারণত বাঘের প্রজননকাল নভেম্বর থেকে মার্চ মাস। এই সময়ের মধ্যে পরিণত কোন বাঘিনী ঋতুমতী হতে পারে। পরস্পরের সান্নিধ্যে আসার জন্যে তখন বাঘ-বাঘিনী উভয়েই এক ধরনের বিশেষ হাঁক পাড়ে। সারা বছরের মধ্যে কেবল এই সময়েই, খুব বেশি হলে দিন দশেকের জন্যে বাঘ-বাঘিনী একত্রে বাস করে। এমন কি এই দশদিনের মধ্যেও ওরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার পুনঃমিলিত হতে পারে। অনেকে সঙ্গম-উন্মত্ত বাঘ-বাঘিনীর মধ্যে আক্রমণের কাহিনীকে ফলাও করে প্রচার করেন। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। বাচ্ছাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত নাথাকলে কোন বাঘিনী বাঘকে আক্রমণ করে না। বড় জোর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাঘের সন্ধান না পেলে কোন বাঘিনীর মেজাজ প্রচণ্ড বিগড়ে যেতে পারে, এমন কি প্রথম মিলনের পরেও তার সে মেজাজ অক্ষুন্ন থাকতে পারে। ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। কেমামান শহর থেকে দূরে ফেরিঘাটের কয়েকজন মাঝি একবার এসে আমাকে বললো—নদীর ওপারে হুটো বাঘ প্রচণ্ড মারামারি করছে। আর তাদের সে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জনে অরণ্য তোলপাড় হয়ে উঠছে। কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই পরের দিন ভোরেই আমার বিশ্বস্ত ড্রাইভার এবং একমাত্র নিত্য সঙ্গী পামাৎকে নিয়ে সেই জায়গাটা দেখতে গিয়েছিলুম। দেখলুম মাটিতে একজোড়া বাঘ-বাঘিনীর পায়ের ছাপ। তখন ব্যাপারটা বুঝতে আমার আর কোন অসুবিধেই হয় নি।

কর্নেল এ. ই. স্টুয়ার্ট তাঁর 'বাঘ এবং অন্যান্য শিকার' গ্রন্থে নিজের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লিখেছেন—একবার তিনি আসন্ন-প্রসবা একটা ভারতীয় বাঘিনীকে গুলি করে মেরেছিলেন, যার সঙ্গে ছিলো প্রায় দশ মাসের একটা বাচ্ছা বাঘ। মালয়ে কিন্তু এমন কোন ঘটনা আমার জানা নেই। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এখানে কোন বাঘিনী গড়ে দুবছর অন্তর প্রসব করে। বাচ্ছা হয় প্রজননের চোদ্দো থেকে পনেরো সপ্তার মধ্যে।

প্রথম যখন বাঘের বাচ্ছা হয় দেখতে ঠিক ছোটখাটো বেড়ালের মতন, কানদুটো যা একটু বড় বড় আর সামনের থাবাগুলো সামান্য একটু চওড়া। কোন বাঘিনীর ছটা পর্যন্তও বাচ্ছা হতে পারে, তবে সাধারণত তিনটের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। বাচ্ছা অবস্থায় ধরা পড়লে সবকটাকেই বাঁচানো সম্ভব, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে বাঘের বাচ্ছা বাঁচে খুব কম। বড় জোর একটা কি দুটো। কেমামানে বসবাসের সময়ের মধ্যে আমি যতগুলো মা-বাঘিনীকে দেখেছি তার সবকটাই একটা করে বাচ্ছা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেবল একটা মাত্র বাঘিনীকেই দেখেছিলুম যার দুটো বাচ্ছা। একবার এক স্থানীয় চীনা কাঠুরে আমাকে বলেছিলো সে নাকি তিনটে বাচ্ছাওয়ালা একটা বড় বাঘিনীকে দেখেছে। আমার যখন সেই বাঘিনীটাকে দেখার অবকাশ হয়েছিলো, দেখেছিলুম তার দুটো বাচ্ছা—বেশ গোলগাল নধর চেহারা, আর তাদের মায়ের ভারি তিরিক্ষি মেজাজ। ছুটিতে যাবার ঠিক দু এক দিন আগে আবার তাদের পায়ের ছাপ মাটিতে দেখলুম, দেখলুম মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল একটাই মাত্র বাচ্ছার পায়ের ছাপ তাকে অনুসরণ করেছে।

অন্য বাচ্ছাটার কি হলো আমি ঠিক জানি না। তবে নিশ্চয় অসুখ-বিসুখ কিছু করেছিলো। হয়তো বা বড় বড় ঘাসের মধ্যে পায়ে শেকড় আটকিয়ে জড়িয়ে গিয়েছিলো, না হয়তো জলে ডুবে মরে গিয়েছিলো। আসলে প্রকৃতিই বাঘের সবচেয়ে বড় শত্রু। না হলে একমাত্র কুমির ছাড়া অন্যকোন জন্তু বাঘকে আক্রমণ করতে সাহস করে বলে আমার জানা নেই। বিশেষ করে মালয়ে এমন ঘটনা সত্যিই খুব বিরল, অন্তত নিজে চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার কখনও হয়নি। তবে শুনেছিলুম

যুদ্ধের আগে জোহোর নদীর বালুবেলায় নাকি একবার একটা বাঘ আর একটা কুমিরকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। সম্ভবত নদীতে জল খেতে নামার সময় কুমিরটা বাঘের পা কামড়ে ধবে ছিলো, তারপর দুজনেই মরণ-পণ সংগ্রাম করে লড়ে গিয়েছিলো—অন্তত বালুবেলায় ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন দেখে স্থানীয় লোকেদের তাই-ই মনে হয়েছিলো। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম—বাঘের বাচ্ছা সত্যিই কিন্তু ভারি সুন্দর দেখতে, এবং বাচ্ছাবেলায় ধরা পড়লে খুব সহজেই পোষ মানে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত-বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুলাংশেই তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা চার মাসের একটা বাচ্ছা বাঘও কাউকে জখম করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া দৈনন্দিন আহার্যের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ মাংসের প্রয়োজনটাও এব সঙ্গে জড়িত এবং ব্যয়বহুল তো বটেই।

বাচ্ছারা হাঁটতে না শেখা পর্যন্ত মাকে খুব কাছাকাছি অঞ্চলে একা একাই শিকার করতে যেতে হয়। তারপর বাচ্ছারা যখন হাঁটতে শেখে, টলমলে পায়ে নেচে কুঁদে হাঁটতে হাঁটতে চলে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। প্রয়োজনবোধে মা-বাঘিনী তখন তাব শিকার অঞ্চলের পরিধিকে আরওবিস্তীর্ণ অথবা পরিবর্তন করতে পারে। ক্ষুদে ক্ষুদে খুব ধারালো দুধ-দাঁত থাকে প্রায় ছমাস পর্যন্ত, যতদিন পর্যন্ত তারা মার দুধ খায়। তারপর দুধ-দাঁত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থান নেয় দ্বিতীয় প্রস্থের শক্ত দাঁত। প্রকৃতির এ এক অদ্ভুত রহস্য—দুধ-দাঁত পড়ার পর নতুন দাঁত উঠতে দীর্ঘদিন সময় লাগলে তো আর ওদের চলবে না, দাঁতবিহীন অবস্থায় না খেয়ে ওরা বাঁচবে কেমন করে। আসলে দুধ-দাঁত নড়া বা পড়ার আগে থেকেই চলে দ্বিতীয় প্রস্থের নতুন শক্ত দাঁত ওঠার প্রস্তুতি, বিশেষ করে নতুন শ্বদাঁতের বেলায় তো বটেই।

দুধ ছাড়ার কিছু আগে থেকেই মা তাদের নরম ধরনের মাংস খেতে দেয়—যেমন খরগোশ, মেঠো ইঁদুর, ময়ুর কিংবা বনমোরগ। এই সময় থেকেই চলে মাংস ছেঁড়ার তালিম, তা সে খাক বা নাই খাক। তারপর থেকে একটু একটু করে খাওয়ার পরিমাণ যেমন বাড়ে, তেমনি আবার বিভিন্ন পশুর নির্বাচিত অংশ—যেমন হরিণ বা বুনো শুয়োরের দাবনা,

কিংবা গলার কাছের নরম মাংস বেছে নেওয়ার রুচিও একটু একটু করে গড়ে ওঠে।

মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুর ঘুর করলেও, বছর খানেক বয়েস না হওয়া পর্যন্ত বাচ্ছারা নিজে হাতে শিকার মারতে সাহস করে না। এই সময়ের আগে পর্যন্ত চলে মার কাছে শিক্ষা নেওয়ার পালা। মা-ই তাদের সামনে কোন শিকারকে ধরে এনে দেয়, যে বেচারি তখনও প্রাণে বেঁচে রয়েছে অথচ ছুটে পালাবার কোন সামর্থ্য নেই। প্রাণ-পাখি খাঁচাছাড়া না হওয়া পর্যন্ত বাচ্ছারা সেই মুমূর্ষু প্রাণীটাকে থাবায় থাবায় অতিষ্ঠ করে তোলে। আসলে মা-ই ওদের প্রকৃত শিক্ষাগুরু এবং রক্ষক, বাবা নয়। আমি অনেককে বলতে শুনেছি—বাঘ নাকি তার নিজের বাচ্ছাদের খেয়ে ফ্যালে। কথাটা কিন্তু আমার পক্ষে আদৌ বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কেননা—বাঘিনী বেঁচে থাকা পর্যন্ত কোনদিনই তা সম্ভব নয়। বাচ্ছারা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত ওদের নিরাপত্তার জন্যে মা-বাঘিনী কোথাও কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে পেছপাও নয়।

কিশোর বাঘ, বিশেষ করে বাচ্ছা সমেত মা-বাঘিনীদের স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা এক রকম প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। মা বাঘিনী এমনই সতর্ক যে মানুষের অস্তিত্ব টের পেলেই বাচ্ছাদের নিয়ে চকিতে উধাও হয়ে যায় গভীর জঙ্গলে, আর বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকলে চোখের পলক পড়ার আগেই সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের ওপর। বেচারির ভবলীলা সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার আর কোন মুক্তি নেই। কেমাসেকের নিবিড় অরণ্যে কমিউনিস্ট সন্ত্রাস-বাদীদের অস্তিত্ব উপেক্ষা করেও বিভিন্ন সময়ে বাচ্ছা সমেত তিনটে মা-বাঘিনীকে খুঁটিয়ে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। একটা করে বাচ্ছা সমেত ছুটো মা-বাঘিনী। ছুটো বাচ্ছাই প্রায় একই মাপের, একই রকম দেখতে। সত্যি, বছর খানেকের বাঘের বাচ্ছাকে এমন ছুর্লভ স্নুন্দর দেখতে,

ছায়া ঘন অরণ্যের মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে মায়ের সঙ্গে তাদের না দেখলে ভাষায় বর্ণনা করা কোনদিনই সম্ভব নয়। আর তৃতীয় বাঘিনীর বাচ্ছাটা প্রায় বছর দুয়েকের, এখন সে নিজেই শিকার করতে শিখেছে। আর কয়েক-দিনের মধ্যেই তাকে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। অত্যন্ত দুঃখজনক, বিদায় গোধূলিবেলার অস্পষ্ট তরল অন্ধকারে আমি ভুল করে তাকেই গুলি করে মেরেছিলুম, দূর থেকে ভেবেছিলুম বুঝি পরিণত কোন বাঘ। এ অনুশোচনায় দীর্ঘ দিন রাত্তিরে আমি ঘুমতে পারিনি।

আগের দুটো বাঘিনীর একটা তার বাচ্চাকে নিয়ে সমুদ্র-সৈকতের কাছে সুবিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে নিয়মিত বেড়াতে আসতো। আশেপাশে কোথাও কোন লোকবসতি বা ঘরবাড়িও নেই, কেবল বিস্তীর্ণ বালির প্রান্তর আর উঁচু নিচু ছোট ছোট কাঁটাঝোপ। এখানে এসে পৌঁছুতে গেলে অগভীর সংকীর্ণ একটা খাঁড়ি পেরিয়ে আসতে হয়। বহু দিন আমি চুপি চুপি এক-কোমর জল ভেঙে এপারে এসে দেখেছি ভিজে বালিতে মা-বাঘিনী আর বাচ্ছাটার পায়ের ছাপ, নেচেকুঁদে হৈ-হুল্লোড় করা বা ভোরের নরম চিকন রোদে পিঠ দিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার চিহ্ন। কিন্তু একটা জিনিস বরাবরই আমাকে বিস্মিত করেছে—মা-বাঘিনী আর বাচ্ছা যখনই ওরা বিশ্রাম নিয়েছে, পরস্পরের কাছ থেকে একটু দূরে কয়েক হাতের তফাতে দুজনে দুদিকে মুখে করে বিশ্রাম নিয়েছে। কেন তা আমি স্পষ্ট করে বলতে পারবো না, তবে সম্ভবত নিরাপত্তার প্রয়োজনেই দুজন দুদিকের ওপর কড়া নজর রেখেছে, যাতে কোথাও কোন দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা না থাকে।

মা-বাঘিনীদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানার জন্যে দীর্ঘদিন আমি নির্জন সমুদ্র-সৈকতে, খাঁড়ির আশেপাশে ওত পেতে লুকিয়ে থেকেছি। বহুদিন বিকেলবেলায় সন্ধ্যের একটু আগে আমি দেখেছি খাঁড়ি পেরিয়ে গলার ঘণ্টার ঠুনঠান শব্দ তুলে গরু বাছুর মোষদের ঘরে ফিরে আসতে, শুনেছি অদূরে বাঘিনীর ক্রুদ্ধ গর্জনে ওদের দুড়দাড় ভারি পায়ের শব্দ। কিন্তু আশ্চর্য, ক্রুদ্ধ গুরু গর্জনে বাঘিনী ওদের ভয় পাইয়ে দিলেও আমি

কখনও ওদের সরাসরি আক্রমণ করতে দেখিনি। প্রথমে ভেবেছিলুম বুঝি যূথবদ্ধ পশুর পালকে বাঘিনী একা আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। কিন্তু এ ভুল ভাঙতে আমার বেশি দেরি হয়নি। একবার দেখলুম আমার কাছ থেকে প্রায় গজ কুড়ি দূরে কাঁটা-ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে আকাশের বুক কাঁপানো প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ গর্জনে বাঘিনীটাকে হেঁকে উঠতে। বাচ্ছাটাকে আশেপাশে কোথাও দেখতে পেলুম না। তখনই ব্যাপারটা বুঝতে আমার কোন অসুবিধে হয়নি। আসলে তখন চলছিলো মায়ের কাছে বাচ্ছাটার শিক্ষা নেওয়ার পালা। বাঘিনীর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জনে পশুর পাল যদি ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে, বাচ্ছাটা তখন হয়তো নিজের চেষ্টায় ছোটখাটো কোন বাছুরকে মারতে পারবে।

একবার স্থানীয় জেলেরা সমুদ্রের ধারে মরা একটা বাছুর, বাছুর ঠিক নয়, বকনাকে পেয়ে আমায় খবর দিয়েছিলো, ওদের ধারণা বকনাটাকে কোন কালো চিতায় মেরেছে। কিন্তু বালিতে পায়ের ছাপ আর মৃত পশুটার গলায় কামড়ের দাগ দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি এটা কার কর্ম। খুরের দাগ আর হুমড়ি খেয়ে পড়ার চিহ্ন দেখে মনে হলো বাছুরটা যতটা না আঘাত পেয়েছে, আতঙ্কিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, বাচ্ছা বাঘটা বকনাটাকে মেরে সেখানেই ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলো। হয় ও অতবড় বকনা-বাছুরটাকে একা টেনে নিয়ে যেতে পারেনি, না হয়তো ধারে কাছে মাকে না দেখে উদ্বিগ্ন হয়েই সম্ভবত পালিয়ে গিয়েছিলো। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণটার ওপরেই আমি বেশি জোর দিতে বাধ্য হয়েছিলুম, কেননা প্রথমত ও মরা বকনাটাকে টেনে নিয়ে যাবার কোনরকম চেষ্টাই করেনি, দ্বিতীয়ত বেশ খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা মা-বাঘিনীর কাছে ওর ফিরে যাওয়ার পায়ের ছাপ লক্ষ্য করেছিলুম। তারপর পাশাপাশি দুটো পায়ের ছাপ গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। আসলে বাচ্ছাটাকে দিয়ে শিকার করানোই ছিলো মা-বাঘিনীর মূল লক্ষ্য, খাবার ইচ্ছে থাকলে অনায়াসেই ফিরে আসতে পারতো বা শিকারটাকে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারতো।

মরা বকনাটাকে টেনে এনে খাঁড়ির ধারে উন্মুক্ত বালিয়াড়ির এক প্রান্তে ফেলে রেখেছিলুম, যদি মা-বাঘিনী আর বাচ্ছাটা ফিরে আসে। যদিও কোন সম্ভাবনাই ছিলো না। কেননা মরা বকনাটাকে ওরা যেভাবে হেলায় ফেলে গিয়েছে, তারপর এমন খোলামেলা জায়গায় শিকারটাকে পড়ে থাকতে দেখে বাঘিনী হয়তো এর ধারে কাছেই ঘেঁষবে না। বাঘ সাধারণত খোলামেলায় জায়গায় খাওয়াটাকে আদৌ পছন্দ করে না, তার ওপর দিনের বেলায় হলে তো কোন কথাই নেই। কিন্তু সেদিন বিকেলবেলায় কিজাল থেকে ফেরার পথে হঠাৎ করেই কেমন যেন মনে হলো, পা মাৎকে গাড়ি থামাতে বললুম, নিঃশব্দ পায়ে খাঁড়ির এপারে এসে দেখলুম মা-বাঘিনী মরা বকনার অদূরে বসে রয়েছে আর বাচ্ছাটা দাবনার দিক থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সম্ভবত গাড়ির শব্দে ওরা আগেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিলো, এবার মানুষের পায়ের শব্দ পেতেই চকিতে অস্পষ্ট গর্জন করে বালিয়াড়ির দিকে ছুটে পালালো। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এই ভরন্ত বিকেলে এমন খোলামেলা জায়গায় ওদের এত স্পষ্ট দেখতে পাবো। আগে থেকে যদি একটু সতর্ক হতে পারতুম ক্যামেরায় চিরদিনের জন্যে দুর্লভ সুন্দর একটা স্মৃতিকে ধরে রাখতে পারতুম। আফশোসে সেদিন আমার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে-ছিলো।

বাচ্ছাদের শিক্ষা নেওয়ার পালা চলে একাদিক্রমে দু বছর পর্যন্ত। কেননা শিকার ধরা ছাড়াও কিশোর বাঘদের আরও অনেক কিছু শিখতে হয়—যেমন শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কেমন করে নিঃশব্দে চলাফেরা করতে হয়, কেমন করে আশ্চর্য সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে নজর রাখতে হয়, কান খাড়া করে শুনতে হয়, নিজের গায়ের গন্ধকে বাতাসের বিরুদ্ধে রেখে কেমন করে অন্য পশুর গায়ের গন্ধ পেতে হয়। সাঁতার শেখাটাও এই পর্যায়ের একটা বিশেষ অংশ। তাছাড়া কার মাংস ভালো, কার মাংস খেতে

নেই (যেমন শজারু) শিখতে হয়। এর ওপর খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপ, অর্থাৎ শরীরচর্চার ব্যাপারটা তো আছেই। প্রথমে বাচ্ছারা যখন খুব ছোট থাকে খড়কুটো শুকনো লতাপাতা নিয়ে খেলা করে, অনেকটা বাতাসে ওড়া একটা পাখির পালককে নিয়ে কোন বেড়াল যেমন খেলা করে ঠিক তেমনি ভাবে। তারপর একটু ভয় পেলেই দৌড়ে পালিয়ে আসে মার কাছে। আর একটু বড় হলে শেখে কেমন করে মায়ের ধরা আধ-মারা পশুটাকে একেবারে শেষ করে দিতে হয়। এই দৃশ্য দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিলো—আধ-মরা একটা শুয়োর-ছানাকে নিয়ে একটা বাচ্ছা এমন ভান করছে যেন শুয়োরছানাটা সত্যিই বেঁচে আছে, এবং ইচ্ছে করলেই সে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু শুয়োরছানাটা যেই একটু মাথা তুলছে অমনি তার মাথা আর ঘাড়ের ঠিক মাঝখানে সামনের পায়ের একটা থাবা বসিয়ে আবার দৌড়ে পালিয়ে আসছে। আমার পায়ের সামান্যতম একটু শব্দ পেতেই হঠাৎ সচকিত হয়ে বাচ্ছাটা শুয়োরছানাটাকে মুখে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলো।

প্রায় বছর দুয়েক পরে শেষ পর্যন্ত এমন একটা দিন আসে যেদিন মায়ের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। একটু একটু করে নয়, বরং বলা যায় হঠাৎ করেই। কাল পর্যন্ত যে মা বাচ্ছাকে রক্ষা করার জন্যে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে পারতো, আজ নিজের সঙ্গীর প্রয়োজনে সে তাদের হেলায় উপেক্ষা করে। ইতিমধ্যে বাচ্ছারাও স্বাবলম্বী হয়ে যায়, মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তাদের খুব একটা অসুবিধে হয় না। অবশ্য পরিণত পূর্ণাঙ্গ কোন বাঘে পরিণত হতে তাদের সময় লাগে বছর পাঁচেক। এই সময়ে আয়তনের চাইতে তাদের দেহের শক্তি আর ওজনই বাড়ে সবচেয়ে বেশি। তখন সে অভিজ্ঞতায় তার মায়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

অনেকেব বিশ্রী ধারণা আছে বাঘ প্রথমেই শিকারের ঘাড় ভেঙে দেয় বা সামনের পায়ের থাবা দিয়ে তাকে হত্যা করে। অতিরঞ্জিত হলেও এ কাহিনী আজও অপ্রচলিত নয় যে বাঘ মানুষের বুকের ওপর থাবা বসিয়ে, বিশেষ করে মেয়েদের তুই স্তনের ওপর তুই থাবা রেখে বুকের রক্ত পান করে। কিন্তু এই ধারণাগুলো আদৌ সত্যি নয়, বরং অবৈজ্ঞানিক। বাঘ সাধারণত পেছন থেকেই শিকারের মাথা, ঘাড় কিংবা কাঁধের ওপর হঠাৎ করে লাফিয়ে পড়ে, তারপর প্রকাণ্ড চোয়াল দিয়ে মাথা আর কাঁধের মাঝামাঝি ঠিক ঘাড়ের কাছে গভীর দাঁত বসিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড জোরে কামড়ে ধরে। এদিক থেকে বাঘের দীর্ঘ এবং অত্যন্ত জোরালো শ্বদাঁত শিকার ধরার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেছন থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে-পড়া বাঘের দেহের ভারে এবং প্রচণ্ড শক্তিতে কামড়ে ধরার আকস্মিকতায় শিকার মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হয়, তখন কোন পশুর ঘাড় ভেঙে যাওয়া এমন একটা বিচিত্র কিছু নয়। তা বলে সেটা ইচ্ছেকৃত নয়, বরং সম্পূর্ণ তুর্ঘটনাই বলা যেতে পারে। নিঃশব্দ পদচারণায় হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়াও ঠিকমত ঘাড় কামড়ে ধরতে না পারলে কিংবা লক্ষ্যবস্তু অনেক দূরে থাকলে অনেক সময় বাঘকে ছুটে গিয়েও শিকার ধরতে হয়। একমাত্র হরিণ ছাড়া বাঘের সে অসম্ভব ক্ষিপ্র গতি কল্পনাও করা যায় না। সে সময়ে বাঘের ভয়ঙ্কব ক্রুদ্ধ গর্জন শুনলে সত্যিই গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে।

এই প্রসঙ্গে বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জনে মানুষের কি ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে তারই ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। বছরের বিশেষ একটা মরসুমে বড় বড় কাছিমরা সব রাত্তিরে ডিম ছাড়ার জন্যে সমুদ্র-সৈকতের ওপরে উঠে আসে। বাঘেরাও ওত পেতে থাকে কখন কাছিমরা ডিম পাড়তে উঠবে ওপরে, আর বাঘেরা থাবা দিয়ে তাদের বালির ওপর উলটেয়ে দেবে। তারপর মনের আনন্দে অসহায় প্রাণীগুলোর দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। এদিকে জেলেরাও ওত পেতে থাকে কখন কি ভাবে সেই সব কাছিমের ডিমগুলোকে সংগ্রহ করবে। এক রাতে এক একটা কাছিম একশোরও বেশি ডিম পাড়ে। মালয়বাসীদের কাছে এটা একটা অত্যন্ত লাভজনক

ব্যবসা। শুধু তাই নয় সরকারও কর বাবদ এর থেকে বছরে যথেষ্ট পয়সা রোজগার করে। স্থানীয় জেলেরা সাধারণত সমুদ্রের ধারে বিশেষ বিশেষ জায়গায় সারা রাত জেগে আগুন জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসে গল্পগুজব করে, তারপর ভোরবেলায় ডিমগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যায়।

১৯৫১ সালের এক ভোরবেলায় পূর্ব উপকূলে ঠিক এমনি এক দল কাছিমের ডিম সংগ্রহকারী নিভে-যাওয়া আগুনের পাশে আপাদ-মস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, আর একটা বাঘ নিঃশব্দ গুটি গুটি পায়ে এসে হাজির হয়েছিলো ঠিক তাদের সামনে। কিন্তু আপাদ-মস্তক কম্বল মুড়ি দেওয়া এমন অদ্ভুত বস্তু সম্ভবত জীবনে সে কখনও দেখেনি, তার ওপর নাক ডেকে থাকলে তো আর কোন কথাই নেই। সম্ভবত ও কৌতূহলী হয়েই কম্বলটা একটু তুলে দেখেছিলো, তারপর এ দুনিয়ার সবচেয়ে আজব জীব মানুষকে দেখে যখন ক্রোধে প্রচণ্ড এক হাঁক পেড়ে চকিতে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গিয়েছিলো, আর তার সেই জলদ-গম্ভীর গুরু গুরু গর্জনে সবাই ধড়ফড় করে জেগে উঠেছিলো, কেবল একজনই মুহূর্তের জন্যে একবার আঁতকে উঠে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো। তার সে জ্ঞান আর কোন দিনও ফিরে আসেনি। বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জনে ভয়েই সে মারা গিয়েছিলো।

নাগালের মধ্যে পেলেই বাঘ শিকার মারে, এবং নিজের শক্তি ও নিপুণতা প্রকাশ করার জন্যে যতগুলো খুশি শিকার মারে, কথাটা কিন্তু আদৌ ঠিক নয়। কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অহেতুক রক্ত-পাতের ঘটনাকে বাঘ বড় একটা আমল দেয় না। এমন কি আগের রাত্তিরে মারা কোন পশুর দেহাবশিষ্টে তার পেট ভরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে নতুন করে সে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টাও বড় একটা করে না। শিকার মারার পর বাঘ সাধারণত মৃত দেহটাকে সুর-ক্ষিত কোন জায়গায়, বিশেষ করে তিন দিক ঘেরা ঘন পত্রপল্লবে ঢাকা কোন নিভৃত জায়গায় টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে নদী কিংবা কোন জলাধারের কাছাকাছি জায়গায় থাকতে, যাতে মাঝে মাঝে

খাওয়া ফেলে উঠে গিয়ে জল খেয়ে আসতে পারে। ফলে এমন কোন নির্জন অথচ উপযুক্ত জায়গার খোঁজে বাঘকে অনেক সময় বহুদূর পর্যন্ত শিকারকে টেনে নিয়ে আসতে হয়, বিশেষ করে গ্রামের কোন খোঁয়াড় থেকে গরু-বাছুর মারলে তো বটেই। অবশ্য শিকার মারলেই যে তাকে টেনে নিয়ে আসতে হবে বা আসবেই, প্রায়শ ক্ষেত্রে নাও মিলতে পারে। তবে সাধারণত কোলাহল বা প্রতিকূলতা এড়িয়ে পরম তৃপ্তিতে খাওয়ার জন্যে স্থাননির্বাচন সম্পর্কে বাঘের খুঁতখুতনি আছে যথেষ্ট।

মারার পর শিকারকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা বাঘের অপরিসীম। অনেকের ধারণা শিকার মারার পর বাঘ তাকে ঘাড়ে করে বহে নিয়ে যায়। ধারণাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। মৃত শিকার যত বড় বা ছোটই হোক না কেন, বাঘ সাধারণত তার ঘাড় কামড়ে ধরে অনেকটা যেমন বেড়াল মুখে করে ইঁদুরকে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে বহে নিয়ে যায়। আর শিকার যদি গরু মোষ বা ওই ধরনের কোন বড় পশু হয় তখন তার ঘাড় কামড়ে ধরে পেছনের পায়ে ভর রেখে অসম্ভব শক্তিতে টানতে টানতে পেছু হটে। একবার জঙ্গলের মধ্যে বাঘে মারা বিরাট একটা বুনো মোষকে আমরা আটজন মিলে দড়াদড়ি দিয়েও বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ঠেলাগাড়ি করে তাকে মাচার কাছে সরিয়ে আনতে হয়েছিলো। অথচ আশ্চর্য, রাত্তিরে আমার অসর্তকতার সামান্য একটু সুযোগ নিয়ে বাঘটা অনায়াসেই তাকে চোখের পলকে খানিকটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। শুধু মাত্র সামান্য একবারের জন্যে 'হুঁ-ক' জাতীয় একটা শব্দ হয়েছিলো। পরে আমি অবশ্য বাঘটাকে গুলি করে মেরেছিলুম, কিন্তু সেই দিনই প্রথম স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম সত্যি বাঘের গায়ে কি অমিত শক্তি। নিজে চোখে না দেখলে সে শক্তির কথা কাউকে বুঝিয়ে বলা কোনদিনই সম্ভব নয়।

শুধু জোরই নয়, টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও বাঘের অপরিসীম। একবার অবস্থাপন্ন এক মালয়ী চাষীর বাড়ির শক্ত কাঠের বেড়া ডিঙিয়ে বাঘ ভেতরে প্রবেশ করে, তারপর খোঁয়াড়ের ঝাঁপ ভেঙে বড় একটা গরুকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। পরের দিন সকালে ভিজে মাটিতে

পায়ের ছাপ আর রক্তের দাগ দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম বাঘটা গরুটাকে টানতে টানতে বেড়ার চারপাশে ঘুরেছিলো কোথায় কোন ফাঁক-ফোকর আছে কিনা দেখার জন্যে। কিন্তু পায়নি। শেষে যেদিক থেকে এসেছিলো প্রায় সেখান দিয়েই অমন শক্ত বেড়া ভেঙে অত বড় গরুটাকে একবারও কোথাও না নামিয়ে ঘাড় কামড়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলো দূরের জঙ্গলে। মাঝপথে সম্ভবত গরুর একটা শিং আটকে গিয়েছিলো গাছের শক্ত একটা শেকড়ে, সেটাকেও সে অনায়াসেই উপড়ে ফেলেছিলো। পায়ের ছাপ আর রক্তের দাগ অনুসরণ করে মৃত পশুটাকে খুঁজে পেয়েছিলুম গভীর জঙ্গলের মধ্যে, অথচ সারাটা পথে কোথাও তাকে নামিয়ে রাখার কোন চিহ্নই খুঁজে পাইনি। কি অসম্ভব ক্ষমতা থাকলে তবেই অত বড় গরুটাকে একবারে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

বাঘ অসম্ভব রকমের রকমের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শুধু স্থান নির্বাচনের রুচিতেই নয়, খাওয়া-দাওয়ার পরিপাটিতেও বটে। বাঘ সাধারণত শিকারেব পেছন থেকে খাওয়া শুরু করে। তার আগে ভেতরের নাড়ি-ভুঁড়ি সব টেনে বার করে ফেলে দিয়ে আসে অনেক দূরে। ফেলে দিয়ে আসে বললে হয়তো একটু ভুলই হবে, বরং বলা যায় নখ দিয়ে আঁচড়ে লতা-পাতা মাটি চাপিয়ে কবর দিয়ে আসে লোকচক্ষুর অন্তরালে। তারপর দাবনার আশেপাশের অংশ থেকে খেতে শুরু করে। মালয়ে থাকাকালীন আমি যতগুলো আধ-খাওয়া পশুকে পড়ে থাকতে দেখেছি, তার সব কটারই বুকের মাঝামাঝি থেকে সামনের দিকের অংশ পড়ে রয়েছে। পেছনের দিক থেকে খাওয়া শুরু না করলে এ অবস্থায় এসে পৌঁছনো কোনমতেই সম্ভব হতো না। শুনেছি মালয়ের কালো চিতা সাধারণত পেটের দিক থেকে খাওয়া শুরু করে, কিন্তু মালয়ী বাঘের ক্ষেত্রে এর কোন ব্যতিক্রম হতে আমি কখনও দেখিনি।

বাঘের খাওয়া সেটাও একটা দেখার মতো জিনিস। খেতে খেতে নিজের মুখের চারপাশে লেগে থাকা রক্ত মাঝে মাঝে দীর্ঘ জিব দিয়ে চেটে পবিষ্কার করে নেয় আর পরম তৃপ্তিতে গলার ভেতর থেকে গরর-গরর এক-রকমের শব্দ করে। ধরতে পারবে না জেনেও ঘরের পোষা বেড়াল যেমন দূরের পাখি দেখে গর্জন করে ওঠে অনেকটা সেই ভঙ্গিতে। অবশ্য তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি জোবে। একবারে খেতে পারলে তো ভালোই, না পারলে পরের বারের জন্যে সযত্নে রেখে দেয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বড় বড় ঘাস বা ঝোপের মধ্যে লুকিয়েও রেখে আসে। শিং খুর, হাড় বা যা খায় না, সেই সব অবশিষ্টাংশ লোপাট করে দেওয়ার জন্যে বাঘ সাধারণত এমন দুর্গম স্থানে ফেলে দিয়ে আসে বা কবব দেয় যে পবে মৃত পশুটার আর কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না।

একবাব মারার পর মৃত পশুটা থেকে খানিকটা খেয়ে চলে গেলো, পরের বারে খাওয়াব জন্যে বাঘ ফিরে এলো না, এমন ঘটনা কিন্তু খুব কমই ঘটে। আধ-খাওয়া পশুটার কাছে বাঘ অবশ্যই ফিরে আসবে, এইটেই সাধারণ নিয়ম—যদি না আকস্মিক কোন কারণে ও আহত হয়, কিংবা নতুন করে কোন শিকার মারতে বাধ্য হয়, অথবা ফেলে বাখা মৃত পশুটাকে মানুষ অহেতুক ভাবে নাড়াচাড়া কবে বা অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যায়। অবশ্য এব যে ব্যতিক্রম হয় না বা হবে না, এমন কোন কথা নেই। আমার নিজে চোখে দেখা, ১৯৫১ সালে কেমা-সেকের মানুষ-খেকো বাঘটা মানুষ মারতে শুরু করার আগে পর্যন্ত একই রাতে পর পর দুটো জানোয়ার মেরেছে। তারই মারা আধখাওয়া পশুটাকে একদিন যেখানে ফেলে রেখে গিয়েছিলো সেই জায়গায় একটা বাছুরকে বেঁধে মাচার ওপর অপেক্ষা করছি, হঠাৎ দেখি বেশ বড় একটা হরিণকে মুখে নিয়ে বাঘটা ফিরে আসছে। বাছুরটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হরিণটাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাছুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপব দুটোকেই সেখানে ফেলে রেখে চলে গেলো। পর পর দুদিন অপেক্ষা করেও তাকে সেখানে ফিরে আসতে দেখিনি। আসলে সে মারার জন্যেই মেরেছিলো, সাধারণত বাঘ যা কখনও করে না। পরে অবশ্য প্রমাণ পেয়ে-

ছিলুম গাদা বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে সে হিংস্র হয়ে উঠেছিলো, এবং যে কারণে পরে সে মানুষ মারতেও শুরু করেছিলো। অবশ্য আত্মরক্ষার প্রয়োজনে একাধিক আক্রমণের ঘটনা বিরল নয়।

বাঘ সাধারণত একই জায়গায় একাধিক দিন থাকে না—একদিন, দুদিন, কি বড় জোর তিনদিন। তারপর খানিকটা দূরে সরে যায়, তারপর আরও খানিকটা দূরে। এমনি ভাবে তিনবার চারবার শিকারের ক্ষেত্রে পালটিয়ে পালটিয়ে আবার তার পূর্বের জায়গায় ফিরে আসে। সেটা অবশ্য নির্ভর করে সেই অঞ্চলের শিকারের পরিমাণের ওপর। কেনন। বাঘ যেমন চেষ্টা করে নিজের গায়ের গন্ধ বাতাসের বিরুদ্ধে রেখে অন্য পশুর অস্তিত্ব টের পেতে, অন্য পশুরাও ঠিক তেমন ভাবে চেষ্টা করে নিজেদের গায়ের গন্ধ বাতাসের বিরুদ্ধে রেখে বাঘের অস্তিত্ব টের পেতে। আর টের পেলেই ওরা আর তার ধারেকাছেও ঘেঁষে না। ফলে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশেষ কোন গ্রামে বা জায়গায় শিকার মারার পর দিন দশ-বারোর মধ্যে সেখানে বাঘের আর কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বাঘের এই ভ্রমণ-পরিধি দীর্ঘ-বিস্তীর্ণও হতে পারে, বিশেষ করে পাশাপাশি অঞ্চলের কোন বাঘ মারা গেলে। একবার বিশেষ কৌতূহলী হয়ে আমি আর পা মাৎ, দুজনে মিলে একটা বাঘকে পায়ের ছাপ ধরে অনুসরণ করেছিলুম। মোটামুটি একটা হিসেব করে দেখেছিলুম সেদিন রাত্তিরে সে ঘুরেফিরে প্রায় বারো মাইল পথ অতিক্রম করেছে, তাও শেষ পর্যন্ত তাকে সম্পূর্ণটা অনুসরণ করতে পারি নি। পরে আবিষ্কার করেছিলুম আমারই গুলিতে নিহত একটা বাঘিনীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে সে তার সাম্রাজ্যকে রাতারাতি বিস্তীর্ণ করে নিয়েছে।

এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না, তবু কখনও একই অঞ্চলে দুটো বাঘ বা বাঘিনী এসে পড়লে, একটির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কেননা কেউই ভীরুর মতো লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে রাজি নয়। প্রজননের সময় ছাড়া এমন

কোন মারামারির দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নি। ১৯৫১ সালে ত্রেনগান্থর স্থানীয় অধিবাসীরা একবার এরকম মারামারির ব্যাপার দূর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলো। প্রথমে শুরু হয়েছিলো দুটো পোষা বেড়াল মুখোমুখি হলে যেমন ভাবে ঝগড়া করে ঠিক তেমনি ভাবে। তখন প্রায় সকাল আটটা, আর গর্জনের শব্দ ভেসে আসছিলো নিচু পাহাড়ের চূড়া থেকে। প্রথমে প্রায় সারা দিন ধরে সমানে চললো মুখোমুখি ক্রুদ্ধ তর্জনগর্জনের পালা, তারপর প্রচণ্ড ঝাপটাঝাপটি, কামড়াকামড়ি, ধস্তাধস্তি। শেষে দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল, মেঘেদের বুক-কাঁপানো সেই হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জন ক্রমশ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে এলো। দেখা গেলো প্রায় বৃদ্ধ একটা বাঘকে মেরে তরুণ একটা বাঘ বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু শত্রুকে মেরে তাকে খাবে না এমন স্বভাব বাঘের নয়, তাই বিজিত শত্রুর দেহ থেকে এক খাবলা মাংস খেয়ে আবার সে তার হৃত সাম্রাজ্যে ফিরে গেছে। এ কাহিনীর সত্যতা যাচাই করে দেখার আমি কোন সুযোগ পাইনি। তবে একবার একটা বাঘকে গুলি করে মারার পর ছাল ছাড়ানোর সময় দেখেছিলুম সারা শরীরে তার দাঁত আর নখের গভীর ক্ষতচিহ্ন। সামনের থাবার দুটো নখ ছিলো না, শ্বদাঁতের একটা নেই ও অন্য একটা শ্বদাঁতের আবার অর্ধেকটা ভাঙা। তখন আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি মরণ-পণ সংগ্রামে এটা একটা বিজয়ী শার্দুল।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আকস্মিক দুর্ঘটনা আর মানুষের নানা রকম ছল-চাতুরী এড়িয়ে ওরা যদি টিকে যায় তো কোন বাঘ বা বাঘিনী মোটামুটি ভাবে পঁচিশ-ত্রিশ বছর পর্যন্ত বাঁচে। তারপর বয়েসের ভারে জীর্ণ অথর্ব হয়ে যখন নিজে শিকার ধরার ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে, তখন অন্যান্য যেকোন বন্য প্রাণীদের মতো নির্জন কোন জায়গায় গিয়ে আসন্ন মৃত্যুর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে রাখে।

মৃত্যু-আসন্ন কোন বাঘকে দেখলে খুব সহজেই চেনা যায়। শুধু যে গায়ের উজ্জ্বলতাই হারিয়ে যায় তা নয়, ডোরাকাটা দাগগুলোও বহু-লাংশে প্রায় বিবর্ণ হয়ে আসে, সারা গায়ে ঘা হয়, মুখের চারপাশের লোমগুলো মনে হবে বিবর্ণ ধূসর। থাবার নখগুলোও তাদের তীক্ষ্ণতা

হারিয়ে ফ্যালে, শিথিল হয়ে যায়। ভিজে মাটিতে ওদের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে থাবার নিচে অসংখ্য ফাটা দাগ। শুধু তাই নয়, হেঁটে যেতে যে রীতিমত কষ্ট হয়েছে সেটাও বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। একবার কেমামানে এক জ্যোৎস্না রাতে একটা প্রাচীন বাঘকে দেখে-ছিলুম, ওর মুখটা দেখে মনে হয়েছিলো যেন একতাল তুষার দিয়ে গড়া। এমন কি জোরে জোরে কষ্ট করে নিশ্বাস নেওয়ার শব্দও আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলুম। একবার ভেবেছিলুম গুলি করে ওর দুঃসহ জীবন-টাকে শেষ করে দেবো নাকি! কিন্তু রাইফেলটা তুলে নিয়ে প্রস্তুত হবার আগেই দেখলুম বেচারি টলতে টলতে তার আপন পথে এগিয়ে চলেছে। মনে মনে ভাবলুম ভালোই হলো, মহান মৃত্যুকে স্বাভাবিক ভাবে বরণ করে ও তার জীবনের গৌরবময় অধ্যায়কে বরং নিষ্কলুষই রাখুক।

তিন/আমার প্রথম বাঘ শিকার
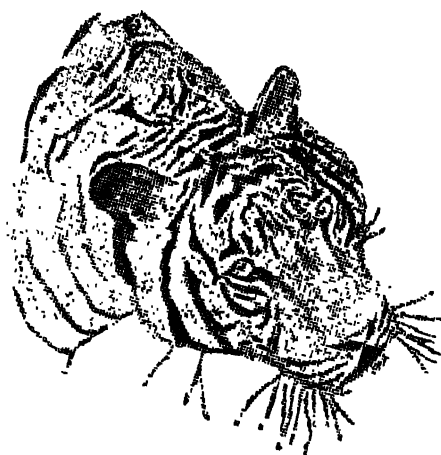
আমার বসার ঘরের দেওয়ালে বিরাট একটা বাঘছাল ঝোলানো ছিলো। যে সেটা দেখতো সে-ই অবাক হয়ে জিগেস করতো, 'আপনি কি নিজে হাতে এটাকে গুলি করে মেরেছেন?'

আমি যখন হাসতে হাসতে বলতুম এ যখন নিজেকে অরণ্যের সম্রাট বলে মনে করতো, অর্থাৎ জ্যান্ত ছিলো, আমার জানা অন্তত কম করেও বারোটা মোষ মেরেছিলো, তখন আমার কথায় কেউ বিশেষ উৎসুক হয়ে উঠতো বলে মনে হতো না, কেন মারা হয়েছে জানার চাইতেও বরং কেমন করে বাঘটাকে মারা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ শোনার জন্যেই সবাই বেশি কৌতূহলী বোধ করতো। এবার সেই কাহিনীই বলি।

কেমামানে বদলি হয়ে আসার প্রায় মাস ছয়েকের মধ্যে আমি নিজে হাতে গুলি করে বাঘ মারার কোন চেষ্টাই করিনি। কেননা প্রথম দিকে নিজের কাজ সামলাতে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলুম, তার ওপর নতুন জায়গা। মাস চারেক লাগলো শুধু বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখতেই। এর ফাঁকে ফাঁকেই চললো স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পালা আর বাঘের সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্রহ করা।

কোমর বেঁধে কাজ শুরু করতে নেমেই পর পর কয়েকটা ভুল করে বসলুম। হবে না তো কি? বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা নেই, জানি না কিছুই স্থানীয় মালয়বাসীদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিলো না। মৃত পশুর চারপাশ থেকে ঝোপঝাড় আগাছা ছেঁটে জঙ্গল সাফ সুফ করা, মাপ বাঁধা প্রভৃতি যাকিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সব ওরাই করতো। তারপর সময়মতো এসে আমাকে খবর দিতো, আমি প্রস্তুত হয়ে মাচায় উঠে বসতুম। আমার হয়ে জেগে ওরাই মৃত পশু-টাকে পাহারা দিতো, তারপর বাঘ এলে আমাকে সর্তক করে দিতো। আমি রাইফেল বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতুম, ওরা যখন আমাকে গুলি

করতে বলতো আমি গুলি চালাতুম। ফলে যা হওয়া স্বাভাবিক তাইই হতো। অবশ্য প্রতিটা ব্যর্থতার যথাযথ হিসেব আমি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলুম এবং অবকাশ পেলেই তার ওপর চোখ বোলাতুম। সুদীর্ঘ আঠেরোটা রাত্রি মশার কামড় খেয়েই কেটে গেলো, অথচ কাজের কাজ কিছুই হলো না। তখন হঠাৎ করেই একদিন মনে হলো—নাঃ, আর না। এবার বাঘে কোন পশু মারলে যাকিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা আমি নিজে হাতেই করবো, এবং রাত্তিরে মাচার ওপরে আমি একা থাকবো। কথাটা সঙ্গে-সঙ্গে আশেপাশের গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেলো। দুটো দিন যেতে না যেতেই পেজ্ঘ্লু নিজে এসে 'শিকার' মারার খবর দিয়ে গেলো।

১৯৪৯ সালের ৩০শে জুন, খবর পেলুম আগের দিন রাত্তিরে কাম্পোংগ কুবাং কুরুতে বাঘে একটা গরু মেরেছে। গ্রামটা কেমামান শহর থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়, কিন্তু গৃহস্থালীর সংখ্যা খুব কম, বড্ড ছড়ানো ছিটোনো। ছোট একটা মেয়ের চোখে অত্যন্ত জরুরী অস্ত্রোপচারের জন্য পা মাংকে সকালে পাঠিয়েছিলুম মালয়ের রাজধানী কুয়ালা লামপুর, শহর থেকে প্রায় তিনশো মাইল দূরে। ফলে আমাকে একাই বেরিয়ে পড়তে হলো। সে সময়ে আমার কাছে ম্যানলিকার রাইফেলের বুলেট না থাকায় সটগানটাই সঙ্গে নিলুম, ও প্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি।

প্রথমে আমি এমন একজনকেও খুঁজে পেলুম না যে আমাকে মরা পশুটা সম্পর্কে কোন খোঁজখবর দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত এক বৃদ্ধাকে খুঁজে বার করলুম যিনি আমাকে মরা গরুটার হদিশ দিলেন। শুধু দিলেন না, আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান পর্যন্ত পৌঁছিয়েও দিয়ে এলেন। সত্যিই, সেই বৃদ্ধার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কোন অন্ত নেই। কেন না মালয়ী মেয়েরা সাধারণত অপরিচিত কোন আগন্তুককে স্বেচ্ছায় কখনও সাহায্য করে না, বিদেশীদের তো নয়ই। আর সে সময়ে মহিলামহলে পরিচিত হবার আমার তেমন কোন অবকাশই ঘটেনি। ফলে সেই বৃদ্ধার আন্তরিক সহযোগিতার কথা আজও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। প্রথমে উনি আমাকে নিয়ে গেলেন বাঘ যেখানে মরা গরুটাকে ফেলে রেখেছিলো। জায়গাটা রবার-বাগিচা থেকে খানিকটা দূরে, প্রায় মাথা-সমান উঁচু

ঘন ঝোপঝাড়ে তিনদিক ঢাকা, কেবল সামনের দিকেই যা খানিকটা উঁচু-উঁচু ঘাসে ঢাকা উন্মুক্ত প্রান্তর।

জায়গাটা আমি খুব ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলুম। কেননা আমি জানি নিতান্ত ছোটখাটো কোন প্রাণী না হলে বাঘ শিকারকে টানতে টানতে নিয়ে আসে এবং রক্তের দাগ, থ্যাতলানো ঘাস, ভাঙা পত্র-পল্লব দেখে কদ্দূর পর্যন্ত তাকে টেনে এনেছে খুঁজে বার করা খুব একটা কঠিন কিছু নয়। পেলুমও তাই। শিকার খুঁজে বার করার ব্যাপারটার মধ্যে রহস্য অনুসন্ধানীদের মতো বেশ একটা রোমাঞ্চ আছে। আমি আর সেই বৃদ্ধা, দুজনে দাগ অনুসরণ করে জঙ্গলটাকে প্রায় এক চক্কর ঘুরে পৌঁছলুম একটা খোলা মাঠে, যেখানে বাঘ প্রথম শিকারকে ধরেছিলো। চারদিকে প্রচুর রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে, অবশ্য তখন শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। জীবন-মরণ সংগ্রামের চিহ্নও ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। তখন তেমন কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না বলে মাটিতে বাঘের পায়ের কোন চিহ্ন খুঁজে পাইনি—নইলে বাঘ না বাঘিনী, ছোট না বড়, অনেক কিছুই পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যেতো।

বৃদ্ধাকে বিদায় দিয়ে এবার আমি একাই ফিরে চললুম। রবার-বাগিচার কাছাকাছি এসে সটগানে এল. জি. কার্তুজ ভরে নিলুম, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলুম বাঘটাকে আমি সত্যিই মারতে চাই কি না। আশেপাশের ঝোপঝাড় এমন ঘন আর নির্জন যে গা ছমছম করতে লাগলো। একবার মনে হলো নিশ্চয়ই কোন বড় বাঘের মুখোমুখি হবো না, আবার মনে হলো সত্যিই যদি হই তখন আমার কি কি প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এই সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শিকারকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললুম। বেশি দূর যেতে হলো না, আমার নাকই বলে দিলো—আমি আমার অনুসন্ধানের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেচি। তাড়াতাড়ি ঝোপঝাড় লতাপাতা দিয়ে তিন দিক ঘেরা গুহার মতো জায়গাটায় ফিরে এসে মরা গরুটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলুম। অবশ্য স্বীকার করতে আমার এতটুকু সংকোচ নেই যে বিশেষ পরিবেশে মরা

পশুকে কেমন করে পরীক্ষা করে দেখতে হয় সে সময়ে আমার তেমন কোন বাস্তব অভিজ্ঞতাই ছিলো না।

পেছনের দুটো পা এবং তার আশেপাশের অংশ খেয়ে যাওয়া মরা গরুটা এমন ভাবে পড়ে রয়েছে যে বেশ কিছু ঝোপঝাড় ছেঁটে না নিলে মাচা থেকে অন্ধকারে বাঘটাকে গুলি করা খুব মুশিকল। কিন্তু প্রথম দিকের কিছু কিছু ব্যর্থতার স্মৃতি তখনও আমার মনে গেঁথে ছিলো, তাই এবারেও সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে আর মন চাইলো না। প্রথমেই ঠিক করলুম এই বিদকুটে জায়গাটাকে যেভাবেই হোক কিছুটা এড়াতে হবে। আর ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই কোমর বেঁধে লেগে পড়লুম। আবিষ্কার করলুম সামনের দিকের সংকীর্ণ ঘাসে-ছাওয়া প্রান্তরের এক পাশ দিয়ে পুরনো পায়ে চলা একটা পথ চলে গেছে। যদি সেই দিকে মৃত পশুটাকে খানিকটা সরিয়ে আনা যায় তাহলে রবার-বাগিচার সুসংলগ্ন বৃক্ষ-প্রাচীরের এক কোণ থেকে বাঘটাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। শুধু তাই নয়, বন্দুকের আওতার মধ্যে পেতেও কোন অসুবিধে হবে না।

প্রচ্ছন্ন চাপা একটা উত্তেজনার মধ্যে প্রায় আধঘণ্টা সময় কেটে গেলো। ইতিমধ্যে আমার অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা দেখে কিছু কৌতূহলী দর্শকও জুটে গেছে। প্রায় গজ কুড়ি লম্বা একটা মোটা তার বার করে সেটার এক প্রান্তে ফাঁসের মতো বানিয়ে নিলুম, তারপর একটা লাঠির সাহায্যে ফাঁসটা গরুর গলার মধ্যে দিয়ে পরিয়ে দিলুম। না, বিশ্রী দুর্গন্ধ বা ঘেন্নার জন্যে নয়, লাঠির সাহায্য নিয়েছিলুম শুধু যতটা সম্ভব মানুষের গায়ের গন্ধকে এড়ানো যায়। এর পরের কাজটা অবশ্য কঠিন এবং আমার একার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিলো না। তাই 'তুয়ান' দেখতে ভিড় করে দাঁড়ানো দর্শকের মধ্যে থেকে আমি চারজনকে বেছে নিলুম, এবং তাদেরকে মরা গরুটা খুব ধীরে ধীরে পথের দিকে খানিকটা টেনে আনতে বললুম।

আমার মনোমত জায়গায় গরুটাকে টেনে নিয়ে আসার পর ফাঁসটাকে আবার লাঠির সাহায্যে খুলে নিলুম। দর্শকের মধ্যে থেকে অনেকেই আমাকে উপদেশ দেবার চেষ্টা করলো ফাঁসটা না খুলে বরং গরুর গলায়

পরানোই থাক, যাতে বাঘ মরা পশুটাকে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে না পারে। উঁহু, আর মূর্খমি করতে আমি রাজি নই। তাই ওদের কথায় কান না দিয়ে এবার মাচা বাঁধার কাজে মন দিলুম। ওদের এক-জনকে সামনের গ্রাম থেকে দুটো লম্বা তক্তা ধার করে আনতে পাঠালুম। প্রথমত সময় খুব অল্প, তার ওপর নতুন করে ডাল কেটে মাচা বানাতে গেলে প্রচুর শব্দ হবে। বলা যায় না বাঘ হয়তো কাছেপিঠেই কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে, ডাল কাটার শব্দে বিরক্ত বা সতর্ক হয়ে উঠতে পারে। তক্তা নিয়ে আসার পর মোটামুটি বেশ নিচুতেই মাচা বাঁধতে বললুম। এটাও ওদের ঠিক মনঃপূত হলো না। মাচাটা যদি ষোলো-আঠারো ফুট উঁচুই না হলো আর অনেকে মিলে যদি সেই মাচার ওপর রাতটাই না কাটাতে পারলো তাহলে সে মাচা থাকা না থাকা দুই-ই সমান। না বেঁধে রাখাতে গরুটাকে বাঘে টেনে নিয়ে যাবে, ঝোপঝাড় সাফ না করলে বাঘটাকে স্পষ্ট দেখা যাবে না, মাচা বড় না হলে হাত-পা ছড়িয়ে বসা যাবে না—অর্থাৎ আমার যা যা অপছন্দ, যাকে আমি সযত্নে এড়িয়ে চলতে চাই, ওদের কোনটাই এক্ষেত্রে সফল হলো না। এমন কি সবকিছু প্রস্তুত হয়ে যাবার পর শুধু একজন যাকে আমি আগে থেকেই অল্প অল্প চিনতুম সে ছাড়া আর সবাইকে চলে যেতে বলায় ওরা তো রীতিমত ক্ষুব্ধই হয়ে উঠলো।

প্রথমে ওদের কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, শেষে চালাকি করে যখন বললুম আমি সম্পূর্ণ আনাড়ি, এর আগে কখনও নিজে হাতে বাঘ শিকার করিনি, বলা যায় না হয়তো ভুলবশতঃ বাঘের বদলে ওদেরই কাউকে গুলি করে বসতে পারি, তখন ওরা সুড় সুড় করে কেটে পড়লো। সবাই চলে যাবার পর আমি এক প্রস্থ নতুন পোশাক চড়িয়ে নিলুম, যাতে সারা রাত মশার কামড়ে বেশি নড়াচড়া করতে না হয়। যা পরে-ছিলুম তার ওপরেই সৈনিকের খাঁকি মোটা কাপড়ের ঢোলা একটা পা-জামা আর সম্পূর্ণ হাতাওয়ালা পাতলা একটা প্যারাসুটের বর্ষাতি পরে নিলুম। কানের পাশ থেকে গলায় ভালো করে জড়িয়ে নিলুম কালো একটা মাফলার। আমার সঙ্গী মালয়ীটা জুলজুল চোখে সারাক্ষণ আমাকে

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। কেননা এর আগে কোন ইউরোপীয়কে ও এমন কিম্ভূতকিমাকার অবস্থায় দেখেনি।

লোকটাকে কি কি করতে হবে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে আমি মাচায় ঠেলে উঠলুম। আগেকার অন্যান্য গদি-আঁটা কুর্সি-ওয়ালা মাচার তুলনায় এই মাচাটা নিঃসন্দেহে কোনমতেই আরামপ্রদ নয়। যাইহোক, মাচায় উঠে ওপর থেকে আমি একটা শক্ত দড়ি ঝুলিয়ে দিলুম, নিচের লোকটাকে বললুম—বর্ষাতি, টোকা, আমার যাকিছু সব ওই দড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিতে। বলা যায় না যদি রাত্তিরে বৃষ্টি হয়, সেই ভয়ে ওগুলো আমি সঙ্গে করে এনেছিলুম। বাঁধাছাঁদার কাজ শেষ হবার আগেই আমি মুখে ঘাড়ে হাতে ভালো করে মশা-নিরোধক তেল মেখে নিলুম। তারপর সব কিছুর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওকে চলে যেতে বললুম। সম্ভবত আমাকে এভাবে একা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে যেতে তার বিবেকে বাঁধছিলো, তবু মুখে কিছু না বলে নিঃশব্দেই সে ফিরে গেলো।

এখন এই নির্জনতার ছোট্ট পৃথিবীতে আমি একা, সম্পূর্ণ একা। তবু সমস্তটা ব্যাপারটা কেমন যেনখুবই রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে। প্রস্তুতিপর্বের সবকিছুর ওপর আমি আর এক ঝলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলুম। না, সমস্ত ব্যাপারটা মোটামুটি বেশ ভালোই এগিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাঘ আসার সম্ভাব্য সময়ের প্রায় ঘণ্টা দুই আগে থেকে যে আমি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে পারছি এর জন্যে নিজেকে বেশ খুশিই মনে হলো। অবশ্য সে সময়ে বাঘ সম্পর্কে আমার স্পষ্ট কোন ধারণাই ছিলো না। আমি আদৌ জানি না পেট পুরে খাওয়ার পর বাঘ দিনের বেলায় শিকারের পাশেই ঘুমিয়ে থাকে কি না, এবং সন্ধ্যের আগেই জঙ্গলে চলে গিয়ে আবার রাত্তিরবেলায় ফিরে আসে কি না। তবে এইটুকু বলতে

পারি—সেই প্রথম মাচার ওপর বসে আমার মনে হয়েছিলো আমি বুঝি সারাটা রাত জেগে ঠিক এমনি ভাবে ধৈর্য ধরে বসে প্রতীক্ষা করে থাকতে পারি। তখন এটুকু সাধারণ ধারণা আমার হয়েছিলো, অন্তত বিশ্বাস করতুম, অন্ধকার গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত কোনরকম নড়াচড়া না করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তারপর রাত হলে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সামান্য কিছু নড়াচড়া করা যেতে পারে, অবশ্য কোনরকম শব্দ না করে। তার পরের কাজ হলো সেফটি-ক্যাচ্ টেনে আমার দোনলা বন্দুকটাকে প্রস্তুত করে রাখা, যাতে প্রয়োজনের সময়ে খুট করেও সামান্যতম কোন শব্দ না হয়।

দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশে ম্লান সূর্যটা ঢলে পড়লো ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ি চূড়ার ওপারে। গোধূলির রাঙা আলো মেখে পাখির ঝাঁক ফিরে চলেছে তাদের নীড়ে। সাড়ে ছটা পর্যন্ত কিছুই ঘটলো না। কিন্তু তার একটু পরেই ডান দিক থেকে সামান্য একটু পাতার খস খস শব্দ যেন আমার কানে এলো। ঘাড় না ঘুরিয়ে আমি মুহূর্তের জন্যে বাঘের পেছনের পায়ের খানিকটা অংশ স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তারপর চকিতে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেলো। একটু পরেই রবার গাছের সারির মধ্যে দিয়ে আমার পেছন দিক ঘুরে বাঘটা নিঃশব্দে এসে পৌঁছুলো তার শিকারের কাছে। নির্জন জঙ্গলেও বাঘ যে এত নিঃশব্দে চলাফেরা করে আমার কোন ধারণাই ছিলো না। ভয়ে বিস্ময়ে ততক্ষণে আমার হৃদ্‌কম্প শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অকপটেই স্বীকার করছি, এত কাছে থেকে বাঘকে এমন স্পষ্ট দেখার সুযোগ এর আগে আমার আর কখনও হয় নি। উত্তেজনায় শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা আমার তখন টানটান হয়ে উঠেছে। নিজে হাতে বাঘ শিকারের এই আমার প্রথম প্রচেষ্টা। কিন্তু মনে হচ্ছে বাঘটা যেন নিজেই এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে সহ-যোগিতা করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নইলে বাঘটা আমার পেছন দিক থেকে ঘুরে এলো অথচ আমাকে দেখতে পেলো না এটা কেমন করে সম্ভব!

আসলে ধৈর্য না হারিয়ে কোন রকম নড়াচড়া না করে চুপচাপ

বসে থাকাটা খুব কাজে দিয়েছিলো। কিন্তু শিকারের কাছে পৌঁছনোর পর বাঘটা সেই যে ডান দিকের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো, মিনিট দশেক হলো তাকে আর বেরুতে দেখলুম না, কিংবা কোনরকম সাড়াশব্দও পেলুম না। আশ্চর্য এত বড় একটা জন্তু জঙ্গলের মধ্যে চলাফেরা করছে, অথচ শুকনো পাতার ওপর এতটুকু মড়মড় শব্দ হচ্ছে না বা ঝোপের গায়ে গা ঘষার সামান্যতমও খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে না! একটু পরেই প্রায় সত্তোর গজ দূরে বাঁদিকের জঙ্গলে অদৃশ্য কোন জায়গা থেকে হঠাৎ হাড় চিবোনোর, ঠিক চিবোনো নয়, দাঁত দিয়ে কামড়ানোর শব্দ শুনতে পেলুম। কি ব্যাপার, জঙ্গলের মধ্যে হাড় কোত্থেকে আসবে? রীতিমত বুদ্ধু বনে গেলুম। নিশ্চয়ই মরা গরুটা টেনে আনার সময় পায়ের হাড়টাড় কিছু খুলে গিয়েছিলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম ভবিষ্যতে এধরনের ভুল আর কখনও করবো না। একটু পরে হাড়ের শব্দও আর শোনা গেলো না। মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম। আসন্ন সায়ান্ধকারে পড়ে থাকা মরা গরুটা আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে আবছা হয়ে যাচ্ছে, ঘাসে-ছাওয়া প্রান্তরের শেষ মাথায় ওটাকে এখন একটা কালো রেখার মতো দেখাচ্ছে। আমার ভয় হলো—শুধু একটা হাড় ছাড়া বাকি অংশটা উধাও হয়ে গেছে ভেবে বাঘটা আবার না অন্য কোথাও নতুন করে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

হতাশায় প্রায় মরিয়া হয়ে যখন মনে মনে ভাবছি এবার থেকে বাঘে-মারা শিকারকে আর কোথাও সরাবো না, তখন যেন হঠাৎ মনে হলো ঘাসে ছাওয়া প্রান্তরের শেষ মাথায় ছায়ার মতো কি যেন একটা নড়ছে। অন্ধকারে জোর করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখ ব্যথা হয়ে গেলো। যদি সত্যি কিছু নড়েও থাকে এতক্ষণে তা থেমে গেছে। নিরাশায় সারা মন আবার ভরে উঠলো। কিন্তু চোখে অন্ধকার সামান্য একটু সয়ে যেতেই কেন জানি মনে হলো মরা গরুটার ওপর কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। সটগানের সঙ্গে বাঁধা ইলেকট্রিক টর্চটা তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে আমি জ্বালিয়ে দিলুম, সোজা আলো গিয়ে পড়লো বাঘের মুখের ওপর। বাঘও চকিতে সামান্য একটু মাথা তুলে সোজা

তাকালো আমার চোখের দিকে। ওর ব্যাজার মুখ দেখে মনে হলো যেন স্পষ্টই বলতে চাইছে, 'এ আলো আবার কোত্থেকে এলোরে বাবা!'

সেদিনের সেই দৃশ্যটা চোখ বুজলে আজও আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, মনে হয় বাঘ আর আমি আমরা দুজনেই যেন বিস্ময়ে জমে গিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছি। টর্চের আলোয় মৃত পশুটা স্পষ্ট আলোকিত হয়ে ওঠেনি, কিন্তু বাঘের ঈষৎ নীলাভ চোখদুটো যেন ছোট ছোট দুটো অগ্নিপিণ্ডের মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে, মনে হচ্ছে যেন সোজা আমার চোখের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো আমার দিকে ভালো করে তাকাবে বলে ও যেন ইচ্ছে করেই মৃত পশুটার ওপর সামনের একটা থাবা তুলে দিয়েছে।

মনে হলো এক যুগেরও অতীত আমরা যেন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। হঠাৎ টনক নড়লো, এভাবে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক নয়, দেরি হলে হয়তো বাঘটা শিকার ফেলে জঙ্গলে মধ্যে গা ঢাকা দেবে। ঠিক কপালের মাঝখানে লক্ষ্য স্থির করে ডানহাতি নল থেকে গুলি চালালুম। চকিতে তিনটে জিনিস একই সঙ্গে ঘটে গেলো। টর্চটা নিভে গেলো। বন্দুকটা সম্ভবত আনাড়ির মতো একটু আলগা করে ধরেছিলুম বলেই আমার চোয়ালের এক পাশে রীতিমত সপাটে এসে ঝাপটা মারলো। আর বাঘটাও সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে আমার বাঁ দিকের ঝোপে প্রচণ্ড জোরে এক লাফ মারলো। কিন্তু সম্ভবত ঝোপের মধ্যে পড়ে আর নড়তে পারেনি। শিরাউপশিরা সমস্ত সত্তা একত্রিত করে আমি জায়গাটাকে চিনে রাখার চেষ্টা করলুম, আবিষ্কার করার চেষ্টা করলুম বাঘটা এখন কোথায়, কি করছে। শুনেছি আহত বাঘ নাকি আরও ভয়ঙ্কর আরও মারাত্মক হয়, ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে। কান খাড়া করে আমি ঝোপের মধ্যে কোনরকম নড়াচড়া বা অন্তিম আর্তনাদ শোনার আপ্রাণ চেষ্টা করলুম। কিন্তু কোথাও কিছু শুনতে পেলুম না।

ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় প্রায় মিনিট কুড়ি কেটে যাবার পর টর্চটা নেড়েচেড়ে দেখলুম। নাঃ, ঠিকই আছে। সামনে থেকে শুরু করে চারিদিকে

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখলুম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলুম না। এমন কোন চিহ্নই চোখে পড়লো না যা দেখে বাঘের পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা গড়ে তুলতে পারি। টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে একটা সিগা-রেট ধরালুম। সিগারেটের কথা এতক্ষণ আমি বেমালুম ভুলেই গিয়েছি-লুম, এখন মনে হলো সত্যিই এটার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। তারপর বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে দিতে ভাবতে লাগলুম বইয়েতে পড়া বড় বড় সব শিকারীরা এর পরের ধাপে কি কি করেন। শুনেছি আহত বাঘকে খুঁজে বার করাটা নাকি বাঘ-শিকারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। কিন্তু ওঁরা কি ভোর না হওয়া পর্যন্ত উদাসীন ভাবে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন, না কি মাচা থেকে নেমে আহত বাঘটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন? এ ক্ষেত্রে যদি বাঘটা ঠিকমত আহত না হয়ে থাকে? তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি দ্বিতীয় পন্থাটাকেই বেছে নিলুম কেননা আশেপাশে সত্যিই কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। তাছাড়া এত ছোট মাচায় ঘুম আমার কিছুতেই আসবে না, আর সে চেষ্টা করলে রাত্তিরে নির্ঘাত মাচা থেকে নিচে পড়ে যাবো।

মাটিতে নামার পর প্রথমেই আমার মনে হলো, যত অসুবিধেই হোক না কেন, মাচায় এর চাইতে ঢের ভালো ছিলুম, অন্তত অনেকটা নিশ্চিন্তে ছিলুম, টর্চের আলোর বৃত্তের বাইরে গা-ছমছমে অন্ধকারে এই ভয়ঙ্কর ছায়াগুলো আমার চারপাশে এমন হাতধরাধরি করে নাচতো না। যা ভেবে নামলুম, মাটিতে নামার পর আর তা করতে পারলুম না। সম্ভবত সাময়িক উত্তেজনায় সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী আমার তখন শিথিল হয়ে পড়েছিলো। বাঘটাকে না খুঁজে চলে যাচ্ছি বলে যে খুশি হয়েছি তা কিন্তু নয়। আসলে সে সময়ের মানসিক অবস্থায় বাঘটাকে খুঁজে বার করা আমার একার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে নেমেই টর্চের আলো ফেলে আমি সোজা রবার-বাগিচার দিকে হনহন করে হাঁটতে শুরু করেছিলুম। বার দুই শেকড়ে পা বেঁধে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ার পর হাঁটার গতি একটু শ্লথ হয়েছিলো। মাঝে একবার জঙ্গলের মধ্যে পথও হারিয়ে ফেলেছিলুম।

যাই হোক কোন রকমে সবচেয়ে কাছের গ্রামে গিয়ে পৌঁছলুম, জানালুম রাতটা ওদের ওখানে কাটাবো। ওরা খুশি হয়েই আমাকে অভ্যর্থনা জানালো। সবার আগে ভালো করে সাবান মেখে স্নান করলুম, গরম মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলুম, তারপর শুতে যাবার আগে একে একে সবার কৌতূহলী প্রশ্নের অজস্র জবাব দিলুম। কেননা গুলির শব্দ ওরা আগেই শুনতে পেয়েছিলো, বাকিটা সম্ভবত অনুমান করে নিয়েছিলো। কিন্তু শুতে যাবার পর কিছুতেই ঘুমতে পারলুম না, বার-বার মনে হতে লাগলো ঠিকমতো গুলি করতে পেরেছিলুম তো? তার ওপর যতবারই দু চোখের পাতা এক করতে যাই ততবারই দেখি আগুনের মতো গনগনে একজোড়া চোখ যেন অন্ধকারে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। সে ভয়ঙ্কর চোখের দৃষ্টি আমি জীবনে কোনদিনও ভুলতে পারবো না।

পরের দিন ভোরে মরা গরু বা আশেপাশের মাটিতে রক্তের দাগ না দেখে বাঘটা সত্যি আহত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা গেলো না। যাঁরা বন্যপ্রাণী শিকার করেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন অসহ্য যন্ত্রণায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে কোন পশুকে আহত বা অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রাখতে নেই, বাঘের ক্ষেত্রে তো নয়ই। যত প্রতিকূল অবস্থায়ই থাক না কেন, আহত বাঘকে খুঁজে বার করতে হয় এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমিও এ কর্তব্যে কোন রকম অবহেলা করতে পারি না, বিশেষ করে কাছেপিঠে যখন গ্রাম রয়েছে। আমার ক্ষেত্রে দুটো জিনিস হতে পারে। হয় বাঘের গায়ে গুলিটা আদৌ লাগেনি এবং রাত্তিরের মধ্যে সে অনেক দূরে কোথাও চলে গেছে, না হয়তো আহত হয়ে কোন ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে, তাকে খুঁজে বার

করতে হবে। সবার আগে খুঁজতে হবে গত রাত্তিরে সে যেখানে লাফিয়ে পড়েছিলো, সেখানে না পেলে রক্তের দাগ অনু সন্ধান করে অন্য কোথাও।

ডান-হাতি নলে কার্তুজ পুরে বাঁ দিকের ঝোপে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করতে না করতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি এলো। কয়েকজন ছুটলো রবার বাগিচার দিকে মাথা বাঁচাতে, কিছু উৎসাহী মালয়ী রয়ে গেলো আমার সঙ্গে। ঝোপের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতে করতে পাতায় সামান্য কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ দেখতে পেলুম। খুশির চেয়ে অখুশিই হলুম সবচেয়ে বেশি—তাহলে কি বাঘটা সত্যিই আহত হয়নি! তবু ভাগ্য ভালো, আর একটু দেরি হলেই বৃষ্টিতে সমস্ত রক্তের দাগ ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যেতো। এবার মনে মনে নিজেকে আরও সতর্ক করে তুললুম। কেউ কেউ ঠেলে উঠলো লম্বা গাছের মাথায়, কেউ কেউ লাঠি দিয়ে ঝোপ ঠ্যাঙাতে শুরু করলো। হাজার বার বারণ করা সত্ত্বেও আমার কথা কেউ কানেই তুললো না। বাঘ শিকারে নিতান্ত নতুন না হলে ওদের এই মূর্খমি আমি কিছুতেই সহ্য করতুম না।

মোটামুটি একটা আন্দাজ করে মাটিতে অস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখে আমি একাই অত্যন্ত সন্তর্পণে বন্দুক বাগিয়ে ধীরে ধীরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললুম। খুব বেশি দূর যেতে হলো না, এক জায়গায় দেখলুম চাপ চাপ রক্ত জলে ধুয়ে ঢাল বেয়ে কলকল করে ছুটে চলেছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাতেই প্রায় কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরে ঝাঁকড়া একটা রডোডেনড্রন ঝোপের নিচে বাঘটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। আর কোন কথা নয়, বুকের সমস্ত রক্ত একসাথে চলকে ওঠার আগেই স্পষ্ট দিনের আলোয় মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালালুম। লাফ মারার কোন অবকাশ না পেয়ে বেচারি হুড়মুড় করে সোজা মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। শুধু সামনের থাবাটা একবার বাড়াবার চেষ্টা করেছিলো।

আমার জীবনে প্রথম বাঘ শিকারই নয়, এমন সামনাসামনি এত কাছ থেকে বাঘটাকে মেরেও আমি আপ্লুত গর্বে ভরে উঠতে পারিনি, বরং নিজেকে কেমন যেন কেবলই অপরাধী অপরাধী মনে হচ্ছিলো। ইতিমধ্যে গুলির শব্দ পেয়ে সবাই আমার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। পরে

বাঘটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার অবকাশ পেয়েছিলুম। বাঘ নয় বাঘিনী। বয়েসে নিতান্তই তরুণী। লম্বা সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি। আগের বাত্তিরে ছোঁড়া গুলিটা মাথায় না লেগে ডান চোখ খুবলে নিয়ে কানের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিলো। সম্ভবত এক চোখ কানা হয়ে গিয়ে বেচারি অশেষ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলো। নাহলে এত সামনাসামনি এমন সহজে ওকে কাবু করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব হতো না। এর দুদিন পরেই আমার '৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফেলের কার্তুজ এসে পৌঁছেছিলো।

চার / কিজালের যমজ বাঘিনী
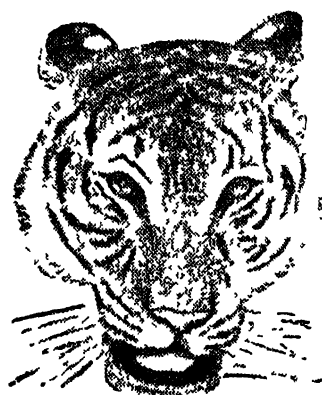
কিছুদিন ধরে কিজালের যমজ দুটো বাঘিনী, যমজই ছিলো, দারুণ বাঁদরামি শুরু করেছিলো। ওদের বাবাও ছিল মোষ মারায় একেবারে নিপুণ ওস্তাদ। আমি যতগুলো বাঘ মেরেছিলুম তার মধ্যে ওদের বাবাই ছিলো সবচেয়ে বড়। নিকষ গাঢ় এক অন্ধকার রাতে যখন তার মারা শিকারটাকে মনের সুখে খাচ্ছিলো, ষোলো গজ দূর থেকে আমি ওটাকে গুলি করে মেরেছিলুম। ওদের মারও বিশ্রী স্বভাব ছিলো, ঘরের পোষা জীবজন্তু ছাড়া তার মন ভরতো না। গরু ছাগল মোষ—যাকেই সে আওতার মধ্যে পেতো না সাবড়ে ছাড়তো না। আসলে কিজালের জঙ্গলে বুনো শুয়োর, সম্বর বা ওই জাতীয় ভালো কোনো প্রাকৃতিক জীবজন্তু বড় একটা পাওয়া যেতো না। ফলে গৃহপালিত পশুর দিকে থাবা না বাড়িয়ে ওদের উপায় ছিলো না।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় ওদের মার শেষ মারা শিকারটার অদূরে বসে অপেক্ষা করছি। আকাশ ঝামরে অঝর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে, তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝোড়ো-হাওয়া। ঝলকে ঝলকে সমুদ্রের ফেনা উড়ে এসে লাগছে চোখে মুখে। বাঘিনীর পায়ের শব্দ শোনা তো দূরের কথা, বৃষ্টির শব্দ আর ঝড়ের দাপটে কান পাতাই দায়। আমার অন্যমনস্কতার একটু সুযোগ নিয়ে বাঘিনী কখন শিকারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আমি টেরও পাইনি। আমি তখন জানতুম না আগে ওকে একবার গুলি করে মারার চেষ্টা করা হয়েছিলো, যেমন জানতুম না অভিজ্ঞ কোন বাঘ বা বাঘিনী আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হলে বুক-দুরদুর-করা এমন প্রচণ্ড গর্জনে অরণ্য আকাশ কাঁপিয়ে তোলে যাতে তার সেই ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জনে পাকা শিকারীও খুব সহজেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, আর সেই সুযোগে সেও চোখের পলকে গা-ঢাকা দিতে পারে।

বেলাভূমির ধারে যেখানে বসে আমি অপেক্ষা করছি, আশেপাশে

কোন গাছ নেই, সামনে সামান্য একটু পাতলা ঝোপ আর নরম মাটিতে পোঁতা নড়বড়ে চারটে খোঁটার ওপর সাতফুট উঁচু একটা ন্যাড়া মাচা। ঝড় বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই পেছনের পাহাড়ে শুনতে পেয়েছিলুম ওর হাঁকডাক, এবার পরিপূর্ণ গলায় পিলে-চমকানো গর্জনে আঁতকে উঠলুম। এমন একটা ভয়ঙ্কর গর্জনে মাচাটাচা উলটিয়ে কেন যে মাটিতে আছড়ে পড়িনি সেটা আজও আমার ভাবতে বিস্ময় লাগে। সে রকম গর্জন শুধু একবার নয়, পরপর আরও দুবার শুনলুম। ভঙ্গিটা এই রকম যেন খেতে বসার আগে যদি আশেপাশে কোন জনমনিষ্যি থাকে তো যেন সোজা দূরে কেটে পড়ে। বৃষ্টিতে ভিজে ঝোড়ো হাওয়ায় একেই তখন ঠকঠক করে কাঁপছি, তার ওপর এ রকম ভয়ঙ্কর বীভৎস গর্জনে আবার দাঁতে দাঁত না লেগে যায়। অসীম ধৈর্য ধরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর শিকারী-টর্চের আলোয় মাথা লক্ষ করে আমি অবশ্য ওর সেই বিদকুটে ভয়-দেখানো গর্জনের যথাযোগ্য জবাব দিতে পেরেছিলুম।

মা মারা যাবার পর যমজ দুবোন খুবই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলো, এবং বয়েস না হলেও সম্ভবত বাধ্য হয়েই নিজেদের শিকারের খোঁজ নিজেদেরই করে নিতে হয়েছিলো। কিছুদিন পর্যন্ত ওরা একই সঙ্গে ঘোরাফেরা করতো, মাঝে মাঝে কিজাল দারাং-এও হানা দিতো। কিন্তু এমন এক সময় এলো যখন বাঘেদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী দুবোনকে আলাদা হয়ে যেতে হলো। একজন গেলো কিজাল পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে— পাঞ্চোর, তেলোক কালোং আর তেলোক মেংগকুয়াং গ্রাম নিয়ে তার বিশাল সাম্রাজ্য। অন্যজন রয়ে গেলো পাহাড়ের এই উত্তর পাড়ে। অথচ আশ্চর্য, বহুবার নির্জন সমুদ্রবেলায় আমি এদের দুজনের পায়ের ছাপ একসঙ্গে দেখেছি, বুঝেছি কিশোরীসুলভ চপলতায় ওদের নিজেদের খেলায় মেতে থেকেছে।

ওরা দুবোনে কিন্তু বেশ ছিলো, দু-একটা গরুছাগল মারলে এমন

কিছুই এসে যেতো না ! কেননা মালয়বাসীরা সাধারণত এটাকে খোদার মর্জি হিসেবেই ধরে নিতো। কিন্তু দেখতে দেখতে ওদের লোভ বেড়ে গেলো, প্রায়ই আশেপাশের গ্রামে হানা দিতে লাগলো। শুধু তাই নয়, মানুষকেও ওরা রীতিমত ভয় দেখাতে শুরু করলো। উত্তর দিকের বাঘিনী বনের পশু বড় একটা না পেয়ে যখন তখন গ্রামের পশু মারতো। আর দক্ষিণ দিকের বাঘিনী অরণ্যঘেরা পাহাড়ি ঢালুতে প্রচুর পরিমাণ শিকার পেতো বলে সম্ভবত গ্রামে হানা দিতো না, কিন্তু কেন জানি সম্ভবত তার আসল নজর ছিলো মানুষের ওপর। একের পর এক তার বদমাইশির নানান কাহিনী এসে পৌঁছতে লাগলো আমার কানে।

একবার এক ক্লান্ত কাঠুরে তেলোক কালোং-এর বড় সড়ক ধরে ঘরে ফিরছিলো, পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলো নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব রেখে একটা বাঘ নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করছে। বাঘ বাঘিনীর তফাৎটা সম্ভবত সে তখন যাচাই করে দেখার অবকাশ পায়নি। সে দাঁড়িয়ে পড়লো তো বাঘটাও দাঁড়িয়ে পড়লো, যেই সে চলতে শুরু করলো অমনি বাঘটাও তাকে অনুসরণ করতে লাগলো। ভয়ে সে আর ছুটতে পারেনি। যাইহোক সে যাত্রায় সে কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলো। স্কুলের ছেলেমেয়েরা জানিয়েছে তাদের ছুটির পর একটা বিরাট বাঘ (তাদের বর্ণনা অনুযায়ী পাঁচফুট উঁচু পনেরো ফুট লম্বা) প্রত্যেক দিন নাকি বড় রাস্তার ওপর শুয়ে থাকে। বিকেলে গরুবাছুর নিয়ে ঘরে ফিরে আসার সময় প্রায়ই নাকি একটা বিরাট বাঘ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ গর্জন করে ছোটদের ভয় দেখায়। একদিন কিজালের পেঙ্ঘুলু, তার কয়েকদিন পরেই তেলোক কালোং-এর পেঙ্ঘুলু এসে আমাকে এইসব কাহিনী শুনিয়ে গেলো।

প্রথমে আমি ভেবেছিলুম বুঝি একটাই বাঘিনী, যেটা কিজালে গরু ছাগল মারছে আর পাঞ্জোর কিংবা তেলোক কালোং-এর লোকজনদের ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পরে পায়ের ছাপ দেখে বুঝেছিলুম—না, এটা অন্য একটা। বনের পথে, আলগা মাটিতে কিংবা বালির পায়ের ছাপ দেখে যেমন বাঘের গতিবিধি অনুমান করা খুব সহজ, তেমনি আবার বৃষ্টি কিংবা শিশিরে ধোয়া বাঘের পায়ের ছাপ দেখে কোনটে নতুন কোনটে

পুরনো বিচার করে বলা খুব কঠিন। তবু ভালো করে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে এইটেই অনুমান করলুম ওরা দুটো ভিন্ন বাঘিনী, দুই যমজ বোন।

আগের দিন রাত্তির দশটা নাগাদ বাঘে একটা ছাগল ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। যার ছাগল ভোরবেলায় এসে সে খবর দিয়ে গেলো। ছাগলটা নাকি খুব একটা বড় ছিলো না, তাই মাটিতে শিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন ওরা খুঁজে পায়নি। সম্ভবত রাতারাতিই সম্পূর্ণ ছাগলটাকে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে, কেননা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওরা মৃত ছাগলটাকে কোথাও খুঁজে পায়নি। আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু এটাও আবার ঠিক, পেট পুরে খাবার পর বাঘ সাধারণত খুব ভারি আর কুঁড়ে হয়ে যায়, তখন খুব বেশি দূরে কোথাও না গিয়ে কাছেপিঠের কোন নিভৃত আশ্রয়ে শুয়ে দিনের উত্তাপটুকুকে এড়াতে চায়। ফলে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ঠিকমত খুঁজলে শিকারকে খুঁজে না পেলেও শিকারের শিকারীকে খুঁজে পাওয়া খুব একটা কঠিন কিছু নয়।

খবরটা পাওয়া মাত্তর আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। পায়ের ছাপের সঙ্গে রক্তের দাগ আর খুব অস্পষ্ট শিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন অনুসরণ করে দক্ষিণে কিজাল পাহাড়ের কোল পর্যন্ত এসে পৌঁছলুম, তারপর বড় রাস্তার ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে পায়ে হেঁটে পাঞ্চোরের দিকে এগিয়ে চললুম। পাঞ্চোরে আমার নিজেরও খানিকটা কাজ ছিলো—সরকারী প্রকল্পে বেশ খানিকটা জমিকে আবাদী করার চেষ্টা চলছে, সেখানে খানিকক্ষণ তদারকি করলুম। তারপর আবার বেরিয়ে পড়লুম অনুসন্ধানের কাজে। প্রায় মাইল দুই আসার পর বালির ওপর দেখলুম আর একটা বাঘিনীর পায়ের ছাপ, পাঞ্চোরের দিক থেকে এসে তেলোক কালোং-এর দিকে ঘুরে চলে গেছে। বিস্ময়ে আমি প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। তাহলে কি একই মাপ একই বয়েস একই অঞ্চলের দুটো বাঘিনী একই রাতে কিজালে হানা দিয়ে শিকার মেরেছে! কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কিজালের পেজ্ঞ্লুর কাছ থেকে জানতে পারলুম বছর খানেক আগে সে একটা বাঘিনীকে দুটো বাচ্ছা নিয়ে কিজালের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে পা মাৎ আর আমি, আমরা দুজনে বিভিন্ন অঞ্চলের বাঘের ওপর মোটামুটি একটা নজর রেখেছিলুম এবং একের পর এক নানারকম সমীক্ষা চালাচ্ছিলুম, কিন্তু এমন ছলনাময়ী দুই যমজ বোনের কথা আমি কখনও শুনিনি। আমরা ওদের নাম দিয়ে ছিলুম উত্তরী যমজ। ওদের খোঁজে দীর্ঘদিন আমরা টর্চ আর রাইফেল নিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি। সুন্দর নারকোল গাছে ঘেরা দারাৎ কিজালে যখন পাহারা দিচ্ছি, খবর এসে পৌঁছুলো উত্তরী যমজ তখন হানা দিয়েছে তেলোক কালোং-এ। তেলোক কালোং-এর ওপর যখন নজর রেখেছি, খবর পেলুম পাঞ্চোরের সমুদ্র আর জঙ্গলের ধার ঘেঁসে চলে যাওয়া বড় সড়কের ওপর সেই কাঠুরেকে ভয় দেখিয়েছে।

একদিন রাত্তিরে উত্তরী যমজ যৌথভাবে পাহাড়ের ঠিক নিচে দারাৎ কিজালের কাছে বিরাট একটা পোষা ছাগল মারলো। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিয়ে এসে সোজা খোঁয়াড় ভেঙে ঢুকলো। ধ্বস্তাধ্বস্তি চিৎকার শুনে বাড়ির কর্তা তাড়াতাড়ি টর্চ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন, আলো ফেলতেই দেখলেন ভাঁটার মত হলদে দু জোড়া চোখ শুধু একবার তাঁর দিকে ঘুরে তাকালো, তারপর অনায়াসেই অত বড় ছাগলটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেলো। পরেরদিন রাত্তিরে তাক বুঝে এমন একটা জায়গা বেছে নিলুম, যেখান থেকে সেই খোঁয়াড়ে আবার ছাগল নিতে এলে আমি খুব সহজেই ওদের মুখোমুখি হতে পারবো। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেবল আমার চোখদুটোই ব্যথা হয়ে গেলো। শুধু হানা দেওয়া কেন, দিন পনেরোর মধ্যে সেই গ্রামের আশেপাশে আমি ওদের কোন টিকিই খুঁজে পেলুম না। স্থানীয় মালয়ীরা বললো আমি যে ওদের পেছনে লেগেছি সেটা নাকি ওরা টের পেয়ে গেছে। পা মাৎ আর আমি দুজনেই খুব হাসলুম, তবু অনুসন্ধান না চালিয়ে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারলুম না। মানুষকে ভয় দেখিয়ে, প্রচুর গৃহপালিত পশুদের মেরে কিজালের আশেপাশের গ্রাম-গুলোতে ওরা তখন রীতিমত ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে চলেছে।

দেখতে দেখতে আবার জুন মাস এসে গেলো। এ সময়ে জেলেরা 'কুয়ালা' বা নদীমোহনায় 'মাক ওয়াং' নামে এক রকমের সপ্তাহব্যাপী উৎসবের আয়োজন করে। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী সমুদ্রদেবের আরাধনা, নৌকা বাইচ, অভিনয় প্রভৃতি এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ। এসময়ে ওরা দুহাতে দেদার পয়সা খরচ করে। পানতাই কিজালের জেলেরাও ঠিক এমনি একটা উৎসবের আয়োজন করছিলো, আমারও আমন্ত্রণ ছিলো সেই উৎসবে। সেদিন ১৯৫০ সালের সাতই জুন। সারাক্ষণ ওদের উৎসবে থেকে প্রায় গভীর রাত্তিরে আমি আর পা মাৎ দুজনে গাড়ি করে ফিরছিলুম পানতাই কিজলি থেকে। কিজালের ঢালু পাহাড়ি পথ বেয়ে সবে যখন নামছি হঠাৎ পা মাৎ-এর অস্ফুট উত্তেজিত আর্তস্বরে আমি চমকে ওর মুখের দিকে ফিরে তাকালুম। পরমুহূর্তেই গাড়ির আলোয় আলোকিত সামনের ঢালুতে একটা বাঘিনীকে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াতে দেখলুম, তারপরেই সে চকিতে অলসভাবে একটা লাফ দিলো পাশের খাদে। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেলো একটা চোখের পলকে।

সৌভাগ্যবশত রাত্তিরে আমি যখনই কোথাও বেরুতুম, টর্চ-ওয়ালা গুলিভরা— ৩৭৫ ম্যানলিকার রাইফেলটা থাকতো আমার সঙ্গে। আমার ইঙ্গিতে পা মাৎ আর একটু এগিয়ে সামনের বাঁকে গাড়িটাকে ঝট করে ঘুরিয়ে ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিলো, আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লুম। কিন্তু হলে কি হবে, বাঘিনী তখন অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটতে শুরু করেছে, গাড়ির আলোর সীমানার বাইরে তখন তাকে আবছা ছায়ার মতো মনে হচ্ছে। ধীর মস্তিষ্কে লক্ষ্য স্থির করে ওটাকে গুলি করে মারা অসম্ভব। তবু চট করে রাইফেলটা তুলে টর্চ জ্বেলে গুলি চালালুম—যা থাকে কপালে।

ম্যানলিকার রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যেন একটা চাপা আর্তনাদও শুনতে পেলুম। তবু নিজের কানকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলুম না, কেননা চোখের সামনে দেখলুম বাঘিনীটাকে অনাহত অবস্থায় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচের গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যেতে। পা মাং-এর ধারণা বাঘিনীর গায়ে নাকি গুলি লেগেছে। আমি কিন্তু সুনিশ্চিত নই। তবু পা মাং-এর কথা যদি সত্যি বলেও ধরে নিই অর্থাৎ বাঘিনীটা যদি আহত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে খুঁজে বার করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু অসম্ভব! গ্রাম থেকে দূরে, লোক নেই জন নেই, পা মাং-এর কাছে অস্ত্রও নেই, তাছাড়া খাদটা এমন গভীর আর নিচের জঙ্গল এমন ঘন যে আমার একার পক্ষে আহত বাঘিনীকে খুঁজে বার করা কোন মতেই সম্ভব নয়। আসলে বাঘিনীটা সম্পর্কে আমি কোন স্থির সিদ্ধান্তেই আসতে পারিনি। তবে ফিরে আসার সময় দূরে আমরা বাঘিনীর চাপা অথচ ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেয়েছিলুম।

পরের দিনটা ছিলো শুক্রবার, মালয়ের অন্যান্য রাজ্যের মতো ত্রেন-গান্নুতেও সে দিনটাকে ধরা হতো রোববার। আগে থেকেই একটা শিক্ষক সম্মেলনে আমার উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা পাকা হয়েছিলো, কোন মতেই এড়ানো গেলো না। তবে তাড়াতাড়ি বিদায় নেবার ব্যবস্থা করলুম, কেন-না সত্যিই তখন আমার মন পড়েছিলো কিজাল পাহাড়ের ধারের সেই গভীর গিরিখাদে। ওখানের কাজ মিটিয়ে পা মাং-এর সঙ্গে বিনজাই গ্রামের পেঙ্ঘুলু চে আবদুল্লা বিন ইসাককেও গাড়িতে তুলে নিলুম। ইসাকের মতো ঝানু পথপ্রদর্শক আমি মালয়ে আর একজনকেও খুঁজে পাইনি। শুধু তাই নয়, ও রীতিমত দুঃসাহসীও বটে। তিনজনে মিলে রওনা হলুম কিজাল পাহাড়ের দিকে।

দিনের আলোয় জায়গাটাকে এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাচ্ছে। কাল যেখান থেকে বাঘিনীটা পেল্লাই একটা লাফ মেরেছিলো, সেখান পর্যন্ত এসে গাড়ি থামালুম। খাদটা সত্যিই খুব গভীর, বৃষ্টি হলে পাহাড়ি ঢল বেয়ে এখান দিয়ে কল কল খল খল করে জল নামে। খাদের পর সবুজ ঘাসে-ছাওয়া এক ফালি সরু জমি, তারপরেই ধাপে ধাপে গভীর জঙ্গল

শুরু হয়ে গেছে। খাদ পেরিয়ে সবুজ জমিটুকু অতিক্রম করার সময়েই আমি ওপর থেকে বাঘিনীটাকে গুলি করার অবকাশ পেয়েছিলুম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জানি না সত্যি ওটার ভাগ্যে কি ঘটেছে। পা মাং আর ইসাককে নিয়ে আমি খাদের মধ্যে নেমে পড়লুম।

খাদটা শুধু গভীরই নয়, জলে-ধোয়া শ্যাওলা-পড়া নুড়িপাথরগুলো অসম্ভব রকমের পেছোল। অত্যন্ত সন্তর্পণে খাদটা পেরিয়ে সবুজ জমিতে এসে পড়লুম। কিন্তু সেখানে বিশেষ সুবিধা করতে পারলুম না, শুধু ঘাসের ওপর অস্পষ্ট আবিষ্কার করতে পারলুম দুটো পায়ের ছাপ। মোটামুটি একটা আন্দাজ করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। অনুমান মিথ্যে হয়নি, পাতার গায়ে নিচের মাটিতে আবিষ্কার করলুম বেশ খানিকটা রক্তের দাগ। তাহলে কি বাঘিনীটা সত্যিই আহত হয়েছিলো ? কিন্তু এমন সৌভাগ্য তো শিকারীদের জীবনে সচরাচর ঘটে না ! হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও আমার জীবনে সত্যি তা ঘটেছিলো। কেননা মৃত বাঘিনীটাকে আমরা অচিরেই আবিষ্কার করতে পেরেছিলুম। খানিকটা গড়িয়ে খানিকটা হড়কিয়ে উঁচু একটা টিলা থেকে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গিয়েছিলো নিচে, মাথাটা আটকে গিয়েছিলো পড়ে-থাকা একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। মুখে দুঃসহ একটা যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

পা মাং-কে পাঠালুম তেলোক কালোং থেকে লোকজন ডেকে নিয়ে আসতে, ইসাক আর আমি রইলুম বাঘিনীর পা বাঁধা-ছাঁদা, যে পথ দিয়ে গিয়ে রাস্তায় উঠবো সে পথের ঝোপঝাড় লতাপাতা পরিষ্কার করার কাজে। আমার বেশ মনে আছে ছজন জেলে আর আমরা কজন মিলে মৃত বাঘিনীটাকে ওপরের রাস্তা পর্যন্ত বয়ে আনতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলুম, বিশেষ করে খাদটা পেরুতেই আমাদের কালঘাম ছুটে গিয়েছিলো। যাই হোক, কোন রকমে তাকে গাড়ির ওপর চড়ালুম। স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি মাত্র কালই যে গাড়ি থেকে তাকে চোখের পলকে একবার মাত্র দেখেছিলুম, আজ সেই গাড়িতে করেই তাকে মৃত বয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

পরে মেপেছিলুম সাত ফুট চার ইঞ্চি। পেছনে লেজের প্রায় সংযোগ

স্থান থেকে গুলিটা ফুঁড়ে চলে গিয়েছিলো সমস্ত দেহ বরাবর। এখন বুঝতে পারছি ফিরে আসার সময় আমরা যে গর্জন শুনেছিলুম, সেটা তার অসহ্য মৃত্যু-যন্ত্রণার অন্তিম আর্তনাদ। কিন্তু একথা সত্যি, গুলিটা বেঁধার পরেও সে বেশ খানিকটা ছুটে গিয়েছিলো, তারপর ভারসাম্য হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিলো মাটিতে। কি অসম্ভব গায়ের শক্তি আর মনের জোর থাকলে তবেই সেটা সম্ভব! জানি না কেন বারবার আমার মনে হয়েছে অত্যন্ত জঘন্য হীন পন্থায় চোরের মতো পেছন থেকে গুলি করে আমি উত্তরী যমজের একটাকে খতম করেছি। প্রথমে ভেবেছিলুম তেলোক কালোং-এর লোকজনদের যে ভয় দেখিয়ে বেড়াতো এটা বোধ হয় সেই বাঘিনী। কিন্তু পরবর্তী কালে মাসখানেকের নানান ঘটনায় প্রমাণ পেয়েছি এটা দারাৎ কিজালের বাঘিনী, বোনের সঙ্গে দেখা করে সম্ভবত সেদিন রাতে ফিরে আসছিলো নিজের এলাকায়। এর পরে বেশ কিছুদিন দারাৎ কিজালে আর বাঘের কোন উৎপাত ঘটেনি, কিন্তু পক্ষান্তরে পাঞ্চোর, তেলোক কালোং-এর নানান ঘটনা এসে পৌঁছতে লাগলো আমার কানে।

জুলাই-আগস্ট, এই দুটো মাস দফতরের নানান ঝামেলায় জড়িয়ে থাকায় শিকারের কাজে বিশেষ মন দিতে পারিনি। অথচ শুনেছি কিজাল থেকে দূরে কেমামানের অন্য পারে ব্যঙ্গোলে বাঘের উপদ্রব বেশ বেড়েই চলেছে। আগস্টের শেষের দিকে হাতের কাজ একটু কমায় পাঁচ দিনের ব্যবধানে একজোড়া বাঘ মারলুম। একুশে আগস্টে প্রথম মারলুম একটা বাঘিনীকে, যখন আগের দিন রাত্তিরে তারই মারা একটা বুনো শুয়োরকে নিয়ে বসে মৌজে খাচ্ছিলো। তারপর ছাব্বিশে আগস্ট, পুর্ণিমার রাতে ফুটফুটে চাঁদের আলোয় দড়ি দিয়ে ছোট একটা ছাগলকে বেঁধে লোভ দেখিয়ে খুব কাছ থেকে গুলি করে মারলুম বেশ বড়-সড় আকারের একটা বাঘকে।

এর ফাঁকে ফাঁকেই অবশ্য কড়া নজর রেখেছিলুম উত্তরী যমজের অন্যটার ওপর। ও তখন রীতিমত মৌরুসী পাট্টা গেড়ে বসেছে পাঞ্চোর, তেলোক কালোং আর সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের মধ্যে। পায়ের ছাপ

অনুসরণ করে দীর্ঘদিন আমি ওর পেছনে পেছনে ঘুরেছি, মোটামুটি ওর গতিবিধির একটা ছকও মনে মনে এঁকে ফেলেছি। কিন্তু বিশেষ কিছু সুবিধে করতে পারিনি। আসলে ওটা অত্যন্ত চালাক। বহুদিন রাত্তিরে ঘাসে-ছাওয়া ছোট্ট একটা পাহাড়ি টিলার ওপর বসে পথের ওপর নজর রেখেছি। কেবল একটা ছাড়া আর সমস্ত পরিকল্পনাই হিসেব মাফিক চলছিলো। শুধু সেই একটা মাত্র গাফিলতির জন্যেই সেবার ওটাকে নাগালের মধ্যে পাইনি। সমুদ্র উপকূল ধরে ও যখন পাঞ্চোরের দিকে আসে, সাধারণত প্রতিবারেই ঘাসে-ছাওয়া সামান্য খানিকটা উন্মুক্ত প্রান্তর পেরিয়ে তবে পাঞ্চোরের পথ ধরে। একদিন আমি সেই মোড়ের মাথায় ছোট্ট একটা টিলার ওপর বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছি। হিসেব মতো গাড়িটাকে আগেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম পাঞ্চোরের সড়ক থেকে প্রায় একশো গজ দক্ষিণে যাতে চট করে ওর নজরে না পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেদিন ও উন্মুক্ত প্রান্তরটুকু না পেরিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে পাঞ্চোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, গাড়িটা খুব সহজেই ওর নজরে পড়লো। গাড়িতে পা মাৎ আর একজন লোক অপেক্ষা করছিলো, ওরা দেখলো বাঘিনীটা চকিতে ঘুরে এক লাফে উপকূলের গভীর জঙ্গলে উধাও হয়ে গেলো। টর্চের আলোয় ওরা কেবল বাঘিনীর চোখদুটোকে একবার মাত্র তীব্র জ্বলে উঠতে দেখেছিলো। যেন বলতে চেয়েছিলো— আমার বোনকে জঘন্য পন্থায় চোরের মতো পেছন থেকে গুলি করে মারতে পেরেছিলে বলে আমাকেও মারতে পারবে, অত সস্তা নয়!

২৮শে সেপ্টেম্বরের বিকেলে ত্রনগানে গিয়েছিলুম মেয়েদের একটা স্কুল পরিদর্শন করতে। সঙ্গে ছিলো আমার স্ত্রী জেন আর পেছনের আসনে জেনের পাশে শিক্ষিকাদের দলনেত্রী চে মুদা বিন আবদুল রহমান। বাঘ শিকারের সময় সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে জেন বহুবার বায়না ধরে ছিলো, কিন্তু আমি কোনবারেই কান দিইনি। কান না দেওয়াটাই স্বাভাবিক।

তুনগান থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেলো। তখন প্রায় সাড়ে নটা। দেখলুম বাঘিনীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার ঠিক মাঝখানে, পাঞ্চোর সড়কে আগের বারে গাড়িটাকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম ঠিক সেইখানে।

দূর থেকে গাড়িটাকে আসতে দেখে সম্ভবত ও ব্যাপারটা আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলো, আড়াআড়ি ভাবে রাস্তাটা পেরিয়ে অলস ভঙ্গিতে হেলতে দুলতে নেমে গেলো সড়কের নিচে। পা মাৎ কোন কথা না বলে আলো নিভিয়ে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিলো, আমিও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লুম। রাইফেলের সঙ্গে বাঁধা টর্চ জ্বেলে রাস্তার নিচেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলুম। জেন গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্তব্ধ বিস্ময়ে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগলো। এখন ঠিক যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি তার নিচেই রাস্তা সারানোর জন্যে পি. ডাব্লু. ডি'র লোকজনেরা মাটি খুঁড়ে বিরাট একটা গর্ত করে ছিলো। পরে মেপেছিলুম গর্তটা পাঁচ ফুট গভীর। সম্পূর্ণ অযাচিত, অবিশ্বাস্যও বলতে পারেন, দেখি কি সেই গর্তের মধ্যে বাঘিনীটা প্রায় গুটিসুটি হয়ে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেতা-দুরস্ত কোন বাঘ বা বাঘিনীর পক্ষে এমন আচরণ সম্পূর্ণ নিন্দনীয়। পরে আমি তেলোক কালোং-এর লোকজনদের বলাবলি করতে শুনেছিলুম কাহিনীটা নাকি আমার বানানো এবং সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত। কেউ অবশ্য বাড়ি বয়ে কথাটা আমার কানে তোলেনি।

প্রথমটা আমিও বেশ ভড়কে গিয়েছিলুম। বার দুয়েক আলোটা অর্ধ-বৃত্তাকারে কানের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে মুখের ওপর ফেলেছিলুম। আর তখনই প্রথম চোখে পড়েছিলো তীব্র আলোর দুটো দ্যুতি, ঠিক যেন আমার পায়ের নিচেই অন্ধকার ফুঁড়ে জ্বলজ্বল করছে। মুখের ওপর আলোটা পড়তেই বুক-কাঁপানো ভয়ঙ্কর গুরুগুরু গর্জনে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বাঘিনীটা আমাকে ভয় দেখালো। আমার স্ত্রীর খুব কাছ থেকে এই দৃশ্যটা দেখা বা শোনার সৌভাগ্য হলেও সেই ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জনে চে মুদা বিন আবদুল রহমান প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আমার তখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা, ওঁদের দিকে নজর দেবার কোন অবকাশই

ছিলো না। বাঘিনীটা যদি সোজা লাফিয়ে ওঠে প্রথমেই আমাকে তার আওতার মধ্যে পাবে। অথচ দু পা পেছনে-যে সরে যাবো তারও কোন উপায় নেই, গাড়িটা দাঁড় করানো রয়েছে আমার ঠিক পেছনে। পা মাৎকে নির্দেশ দেবার মতোও কোন মানসিকতা আমার তখন ছিলো না। তবে মুহূর্তের মধ্যে শুধু এইটুকু স্পষ্ট অনুভব করতে পারলুম—যাকিছু করতে হবে খুব ধীর স্থির মস্তিষ্কে রীতিমত বুদ্ধি খাটিয়ে। আমি ইচ্ছে করলে তখনই সেই অবস্থাতেই দুটো নল থেকে গুলি চালিয়ে বাঘিনীটাকে শেষ করে দিতে পারতুম। কিন্তু তাতে কোন সর্তেই সে আমাকে ছেড়ে কথা কইতো না। সামান্য একটু এদিক ওদিক হলে মেয়েদের আক্রমন করতেও সে পেছপা হতো না। কেননা আমি জানি আহত শার্দুলের চাইতে হিংস্র কোন প্রাণী পৃথিবীতে আর নেই।

চকিতে একটা বুদ্ধি আমাব মাথায় খেলে গেলো। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল ধরা অবস্থাতেই হাত-দুটো একটু ওপরে তুলে আমিও বাঘিনীটার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড জোরে অস্বাভাবিক ভাবে চিৎকার করে উঠলুম। এর আগে কোন মানুষের কাছ থেকে এ রকম উৎকট আওয়াজ বাঘিনী কোনদিন কল্পনাও করেনি। ঠিক যেমন আমিও ভাবতে পারিনি আমার এই বিভৎস বিটকেল চিৎকার কোন সতর্ক বাঘিনীর ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে। অতর্কিতে বাঘিনীটা এক পাশে সরে গেলো, এবং চোখের পলক পড়ার আগেই এক লাফে গর্ত থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করলো। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পা ম'ৎ আগেই গাড়ির সামনের দুটো আলোই জ্বালিয়ে দিয়েছিলো। সেই আলোয় দ্রুত ধাবন্ত বাঘিনীটাকে আমি আবার পেছন থেকে গুলি করলুম। এবারের দূরত্ব অবশ্য রাস্তা থেকে কুড়ি গজেরও কম। গাড়ির আলোয় স্পষ্ট দেখলুম গুলি লাগতেই বাঘিনীটা ডিগবাজি খেয়ে চকিতে একবার ঘুরে গেলো। অর্থাৎ মুখটা আমার দিকে করে মাটিতে পড়ে চার পা শূন্যে তুলে ভীষণ ভাবে ছুঁড়তে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আমিও খানিকটা এগিয়ে গেলুম। কিন্তু রাইফেল তুলে প্রস্তুত হওয়ার আগেই দেখলুম বাঘিনীটা আর এক পাক ঘুরে চোখের নিমেষে উধাও

হয়ে গেছে। বাঘিনীটা যেখানে পড়েছিলো সেখানে দেখলুম চাপ চাপ রক্তের দাগ। কিন্তু ওই অবস্থাতে কি করে ছুটে গিয়ে ও আবার জঙ্গলে প্রবেশ করলো কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকলো না।

ইতিমধ্যে দরজা খুলে পা মাৎ বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সেই রাত্তিরেই বাঘিনীটাকে খুঁজতে বেরুনো উচিত কিনা আলোচনা করতে দেখে জেন আঁতকে উঠলো। স্পষ্টই বুঝতে পারলুম দুঃস্বপ্নের ঘোরটা ও তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এত রাত্তিরে জঙ্গলে ঢোকার মতো তেমন কিছু পোশাক-আশাকও আমার পরণে ছিলো না, তার ওপর গাড়িতে অজ্ঞান অবস্থায় একজন ভদ্র মহিলাও সঙ্গে রয়েছেন—এই সব সাত পাঁচ ভেবে তখনকার মতো আহত বাঘিনীটাকে খোঁজা স্থগিত রেখে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম।

পরের দিন সকালেই আমি, পা মাৎ আর আবদুল্লা নামে একজন পেজ্জলুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম আহত বাঘিনীটার খোঁজে। পাঞ্চোর সড়কের ওপর গাড়ি রেখে আমরা জঙ্গলের পথ ধরলুম। গতকাল রাত্তিরে বাঘিনীটা যেখানে ডিগবাজি খেয়ে উলটিয়ে পড়েছিলো এখন দেখলুম সেখানে চাপচাপ রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে রয়েছে। সেই রক্তের দাগ আর ভাঙা ঝোপঝাড় ছেঁড়া লতাপাতা অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে চললুম। অবশেষে এসে পৌছলুম পাহাড়ের ঢালুর নিচে অল্প অল্প আগাছায় ঢাকা বিস্তীর্ণ একটা জলা-ভূমির সামনে। জল খুব সামান্যই। হাঁটুর ওপর কাপড় গুটিয়ে আমরা তিনজনেই নেমে পড়লুম জলার মধ্যে। কেননা এ ছাড়া অন্যপারে পৌছনোর কোন উপায় ছিলো না। তাছাড়া বাঘিনীটাও নেমে ছিলো এই জলার মধ্যে। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হলো অন্য পারে বাঘিনীটা কোথা দিয়ে ওপরে উঠেছে সেইটে খুঁজে বার করা। আমরা তিনজনে তিনদিকে রীতিমত অভিযান চালিয়ে তন্নতন্ন করে ম,খুঁজলু কিন্তু কোথাও কোন বাঘিনীর পায়ের ছাপ দেখতে পেলুম

না। আর পাওয়া সম্ভবও নয়। কেননা অন্যপারে জলের কিনারা থেকেই ধীরে ধীরে উঠে গেছে শক্ত পাথর। অসম্ভব জেনেও খুঁজলুম, খুঁজলুম ঝোপঝাড়ে, নিচু নিচু গাছের পাতায়—যদি ছিটে ফোঁটাও রক্তের দাগ-টাগ কোথাও লেগে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য, ঠিক যেন স্রেফ ভোজবাজির মতো সবকিছু হাওয়ায় নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে।

এদিকে দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে এলো, রোদের তেজও বাড়তে লাগলো। খিদেয় নাড়ি তখন চোঁ চোঁ করছে। অথচ গুলি খেয়ে বাঘিনী-টা যেভাবে মাটিতে আছড়ে পড়েছিলো, তাতে রীতিমত আহত না হয়ে যায় না। কিন্তু আন্দাজে কিছুই বলা সম্ভব নয়। যদি বাঘিনীটা নিতা-ন্তই মারা না গিয়ে থাকে তাহলে ওকে ওই অবস্থায় অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে রাখাটা যেমন ঠিক নয়, তেমনি আবার আশেপাশের গ্রামগুলোর কথা ভেবে ওকে ওই আহত হিংস্র অবস্থায় ছেড়ে রাখাটাও কোন মতে সমিচীন হবে না। তাই তিনজনে মিলে শলাপরমর্শ করে ঠিক করা হলো আপাতত অনুসন্ধানের পালা সাঙ্গ করে আমরা ঘরে ফিরে যাবো, তারপর বিকেলের আগেই আবার গ্রাম থেকে কিছু লোকজন জুটিয়ে এনে ঝোপ পেটানো শুরু করবো। লোকজন জোটানোর ভার রইলো পা মাৎ আর আবদুল্লার ওপর।

কোন রকমে চাট্টি নাকেমুখে গুঁজে আবার বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম পা মাৎ আর আবদুল্লা তাদের দায়িত্বভার যথাযথ ভাবে পালন করেছে। মাঝিপাড়া থেকে জুটিয়ে এনেছে প্রায় পঁচিশ ত্রিশজন জোয়ান মালয়ীকে। সবাই স্থানীয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, কয়েকজনের হাতে আবার সটগানও রয়েছে দেখলুম। এদের মধ্যে থেকেই বেছে বেছে পরে একটা শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুলেছিলুন, যারা আমার বদলি হয়ে যাবার পর বাঘের হাত থেকে নিজেদের সম্পত্তি বাঁচাবার জন্যে সমস্ত দায়িত্ব ভার তুলে নিয়েছিলো নিজেদেরই কাঁধে। সে যাই হোক, দুপুরে ফিরে আসার সময় যে ফন্দিটা মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করছিলো, এবার সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে সমস্ত পরিকল্পনাটা ওদের কাছে খুলে বললুম।

জলায় নামার পর বাঘিনীটা যখন আবার তার আগের পথে ফিরে

আসেনি তখন এটা খুবই স্পষ্ট জলার অন্যপারে কোন না কোন দিক থেকে সে ওপরে উঠেছে। সুতরাং সবচেয়ে সহজ হবে যদি আমরা বিস্তীর্ণ জলাটা ঘুরে পাহাড়ের ওপর থেকে ঝোপ পেটাতে পেটাতে নিচে নামি। দুর্ভাগ্যক্রমে আহত বাঘিনীটা যদি ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করে—হয় ওকে জলা পেরিয়ে আবার পাঞ্জোরের দিকে ফিরে যেতে হবে, নয়তো জঙ্গল ছেড়ে সমুদ্রবেলার দিকে নামতে হবে। তখন ওর পায়ের ছাপ ধরে অনুসন্ধান করা খুব একটা কঠিন হবে না। আর কিছু না হোক অন্তত ব্যাপরটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। তিনটে দলে ভাগ করে সমস্ত লোকজনদের আমি সার-বেধে দাঁড় করিয়ে দিলুম, পরস্পরের ব্যবধান রইলো প্রায় তিন গজ করে। দল তিনটের পরিচলনার দায়িত্বভার রইলো পা মাৎ, আবদুল্লা আর আমার ওপর। ঠিক হলো কেউ কোন বিপদে পড়লে কিংবা সাহায্যের প্রয়োজন হলে সংকেত দেবে।

ঝোপ পেটানো যখন শুরু হলো দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে।

এখান থেকে শুরু করে এগুতে থাকলে পা মাৎ-এর দলটা পৌঁছুবে সমুদ্রের দিকে, আমার দলটা পৌঁছুবে ঠিক মাঝখানে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির অন্যপারে, আর আবদুল্লার দলটা পৌঁছুবে পাঞ্জোরের প্রধান সড়কের দিকে। প্রথম দিকে সবার উল্লসিত চিৎকার, টুকরো টুকরো কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তা সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেলো। আমরা যে যার বিচ্ছিন্ন দলটাকেই তখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি। ঝোপ পেটানো চলেছে পুরো দমে। বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি, আর কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছি কোথাও কোন সংকেত-সূচক শব্দ শোনা যায় কি না। ঘণ্টা খানেক কেটে গেলো, কিন্তু বাঘিনী তো দূরের কথা তার অস্তিত্বের কোথাও কোন চিহ্নও খুঁজে পেলুম না। পা মাৎ আর আমার—দুটো দলই যখন প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁছুবো পৌঁছুবো করছে, হঠাৎ তৃতীয় দলটা থেকে পূর্বের প্রতিশ্রুতি মতো সংকেত-সূচক বাঁশি বেজে উঠলো। যে যার দল ভেঙে আমরা পড়ি কি মরি করে ছুটলুম পাহাড়ের দিকে বাঁশির শব্দ লক্ষ্য করে।

ছুটতে ছুটতে বড় বড় ঘাসে-ছাওয়া সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দোমড়ানো-মোচড়ানো ঘাসের চিহ্ন দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলুম এখানে কোন বাঘ বা বাঘিনী অনেকক্ষণ ধরে শুয়েছিলো, নয়তো সজোরে আছড়ে পড়েছিলো। ঘাসের ওপর নাক নামিয়ে এনে গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারলুম আমার অনুমান নিথ্যে নয়, গত রাত্তিরে ও এখানেই ছিলো এবং আহত অবস্থায়। অর্থাৎ বাঘিনীটা তাহালে এখনও বেঁচে রয়েছে ! চকিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমি চিৎকার করে সমস্ত লোকজনদের ছুটতে নিষেধ করলুম এবং যতটা সম্ভব সার-বেঁধে দাঁড়াবার নির্দেশ দিলুম, যাতে আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যৌথ ভাবে খোঁজার প্রয়াস চালাতে পারি। কিন্তু তার আগেই বাতাসের বুক চিরে ছুটে বেরিয়ে গেলো একটা গুলির শব্দ। আচম্বিতে এত কাছে গুলির শব্দ শুনে আমি প্রায় চমকে উঠলুম।

ঘটনার কেন্দ্রে যখন এসে পৌঁছলুম চারদিকে তখন রীতিমত ভিড় জমে গেছে, আর সেই বৃত্তের মধ্যে রক্তাপ্লুত অবস্থায় একটা বাঘিনী পড়ে রয়েছে। আবদুল্লার দলের আলি নামে একজন তরুণ সটগান হাতে মৃত বাঘিনীটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই অবস্থাতেই সামান্য একটু ভিড় ঠেলে পরপর কয়েকটা ছবি তুললুম। গতরাত্তিরে আমার ছোঁড়া গুলির চিহ্নটা স্পষ্ট দেখতে পেলুম। পেছনের দাবনার সামান্য একটু নিচে থেকে প্রবেশ করে গুলিটা সোজা গিয়ে আঘাত করেছে তৃতীয় কশেরুকায়। যাক, বেচারি তাহলে এতক্ষণে তার দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেলো।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা ভেবে আমি অবাক না হয়ে পারিনি, সকাল বেলায় জলা পেরিয়ে এই জায়গাটার আশে পাশে আমরা বেশ কয়েকবার খুঁজেছি। জায়গাটা জলার প্রান্ত থেকে তিনশো গজ দূরেও নয়, অথচ পায়ের ছাপ বা অন্য কোন চিহ্ন তো দূরের কথা বাতাসে বাঘের গায়ের গন্ধ পর্যন্ত পাইনি। সম্ভবত আহত বাঘিনীটা বুঝতে পেরেছিলো আমরা ওকে খোঁজাখুঁজি করছি, তাই কোনরকম শব্দ না করে অসহ্য মৃত্যু-যন্ত্রণা বুকে চেপেও ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে চুপচাপ পড়ে-

ছিলো। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে সচারাচর এমনটা ঘটে না। আমার সঙ্গে পা মাৎ আর আবতুল্লাও সম্পূর্ণ একমত—এটা উত্তরী যমজেরই অন্য বাঘিনীটা। কয়েক দিন আগে কিজাল পাহাড়ে যে বাঘিনীটাকে দূর থেকে গুলি করে মেরেছিলুম এটা তার চেয়ে মাত্র এক ইঞ্চি ছোট—সাত ফুট তিন ইঞ্চি। এ ছাড়া আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র এবং বুদ্ধির দিক থেকেও এটা ঠিক তার বোনেরই মতন।

এমনি ভাবে কিজালের যমজ তুই বোনের মৃত্যু হলো। মৃত্যু হলো গুপ্ত আততায়ীর হাতে নিহত মানুষের মতো অশিকারজনিত হীন পন্থায়। তুজনেই অপ্রত্যাশিত ভাবে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলো ঠিক পথের ওপর, তুজনেই গুলি খেয়ে মরলো পেছন থেকে। মালয়ে শিকার-জীবনে কেবল এই তুটো মাত্র বাঘিনীই, যাদের অনুসরণ করতে আমি রীতিমত ব্যর্থ হয়েছিলুম। মানুষ সম্পর্কে কিছুটা উদাসীন না হলে হয়তো এমন আকস্মিক ভাবে এদের মুখোমুখি হবার কোন সুযোগই পেতুম না। তবু আমি বলবো—তেলোক কালোং; পাঞ্জোর আর দারাৎ কিজালের মানুষেরা এদের মৃতুতে যতটা না অনাবিল উচ্ছলতায় খুশি হতে পেরে-ছিলো, ব্যক্তিগত ভাবে আমি মর্মাহত হয়েছিলুম তার চাইতে অনেক অনেক বেশি।

বাঘ সাধারণত মানুষ-খেকোয় পরিণত হয় না, অন্তত মালয়ে তো নয়ই। নানান কারণে একটু একটু করে তার স্বভাব-চরিত্র থেকে বিচ্যুত হলে তবেই কোন বাঘ মানুষ মারতে সাহস করে। তবে একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে তখন সে হয়ে ওঠে দুর্দম, হিংস্র। তখন স্থানীয় শিকারীদের দিয়ে তাকে শায়েস্তা করা সম্ভব না হলে ডাক পড়ে অভিজ্ঞ শিকার-দফতরের পাকা শিকারীদের। ফলে তেমন কিছু একটা বাড়াবাড়ি শুরু করার আগেই এ দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় মানুষ-খেকো একটা বাঘের জীবন।

স্থানীয় লোকের মুখে শুনেছি যুদ্ধের আগে ত্রেনগানুর দুনগান প্রদেশে একটা বাঘ নাকি ছত্রিশজন মানুষকে মেরেছিলো। এ কাহিনীর যথার্থতা সম্পর্কে আমি কিন্তু সুনিশ্চিত নই। যদি এটাকে সত্যি বলে ধরেও নিই, তাহলে এইটেই মালয়ে মানুষ-খেকো বাঘের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নর-হত্যার তালিকা। অবশ্য ভারতবর্ষের মানুষ-খেকো বাঘ কিংবা চিতার তুলনায় এ সংখ্যার নজির কিছুই নয়। সংখ্যা দুটোকে পাশাপাশি রাখলে বরং হাসিই পাবে। 'কুমায়ুনের মানুষ-খেকো বাঘ' এবং 'রুদ্রপ্রয়াগের চিতা' জিম করবেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি শিকার কাহিনী, যেখানে তিনি পরপর বেশ কয়েকটা মানুষ-খেকোর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, যারা কেউ কারুর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আর বাঘের নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে জিম করবেটের চেয়ে অভিজ্ঞ দ্রষ্টা আর কেউ ছিলেন বা আছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। তাঁরই দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি—চম্পাবতের মানুষ-খেকো বাঘিনীটা একাই মেরেছে চারশো ছত্রিশ জন মানুষকে, আর রুদ্রপ্রয়াগের একটা চিতা মেরেছে একশো চুরানোব্বুই জন মানুষকে। সে তুলনায় দুনগানের মানুষ-খেকো বাঘের মারা নরহত্যার সংখ্যাটা কোন নজিরই নয়।

তবু আমার এই সীমিত অভিজ্ঞতার মধ্যে যতটুকু জানি—মালয়ের কোন মান্থষ-খেকো বাঘ গোটা কুড়ি মান্থষ মেরে আতঙ্কের সাম্রাজ্যকে বিস্তীর্ণ করার আগেই হয় গুলি খেয়ে মরেছে, নয়তো অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সুকৌশলে পাতা ফাঁদে পা দিয়ে চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে। আসলে মালয়ের মান্থষ-খেকো বাঘের চরিত্রটাই সম্পূর্ণ আলাদা। ঘটনা দিয়েই শুরু করি—ত্রেনগান্থর একটা বাঘ প্রথম মান্থষ মারে ১৯৪৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বরে। তারপর আরও চারটে মান্থষ মারে—১৯৪৮ সালের ১৫ই জুনে, ২০শে জুনে, ৮ই সেপ্টেম্বরে এবং ১৭ই ডিসেম্বরে। ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে একজন পেজ্‌ঘ্‌লু তাকে গুলি করে মারার আগে পর্যন্ত বাঘটা আরও গোটা চারেক ছাগল মারে। ঘটনাক্রমে নরখাদকটা একটা বাঘ, এছাড়া মালয়ে থাকাকালীন আমি যেকটা ত্রেনগান্থর মান্থষ-খেকো বাঘের হিসেব রেখেছিলুম তার প্রায় সবটাই বাঘিনী। ১৯৫১ সালের ১১ই মার্চে রবার সংগ্রহকারী যে মালয়ীটাকে বাঘে ধরে নিয়ে যায়, তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন আর পায়ের ছাপ দেখে বুঝেছিলুম সেটা একটা বাঘিনী। ১৯৪৯ সালে পেরাকে যে সাতজন চীনাকে বাঘে মেরেছিলো সেটাও একটা মা-বাঘিনী, যার দুটো বাচ্ছার মধ্যে একটা বাচ্ছা পরে ফাঁদে ধরা পড়েছিলো। ১৯৫০ সালে বাঘিনীটা হঠাৎ করেই কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়, তার সুনির্দিষ্ট মৃত্যুর খবর আমি কিছু পাইনি।

আমার মতে মালয়ের মান্থষ-খেকো বাঘ ভারতবর্ষের মান্থষ-খেকো বাঘের তুলনায় তেমন ভয়ঙ্কর নয়, তার কারণ—

১. ভারতবর্ষের তুলনায় মালয়ের বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র এত কম আর সীমিত যে পরপর কয়েকটা মান্থষ মারলেই তাকে খুঁজে বার করা এমন একটা কিছু কঠিন নয়।

২. ভারতবর্ষের গ্রামবাসীদের তুলনায় মালয়ীরা বাঘ মারায় অনেক বেশি ওস্তাদ এবং অত্যন্ত সতর্ক।

৩. মালয়ে অভিজ্ঞ পাকা শিকারীরা সবসময় গ্রামবাসীদের সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত থাকে।

প্রথম দুটো মতকে সমর্থন করার স্বপক্ষে আমি ভূরি ভূরি প্রমাণ

দিতে পারি। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫১ সালের জুলাই-এর মধ্যে কেমাসেকের যে মানুষ-খেকো বাঘটা ত্রেনগান্নুতে তেরোজন মানুষকে মেরেছিলো তার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রের পরিধি ছিলো দেড়শো বর্গ মাইলের এতটুকু বেশি নয়। অথচ ভারতবর্ষে চৌগড়ের যে মানুষ-খেকো বাঘিনীটা চৌষট্টিজন মানুষকে মেরেছিলো কম করেও তার বিচরণ ক্ষেত্রের পরিধি ছিলো দেড়হাজার বর্গ মাইল। আর দ্বিতীয় মতের স্বপক্ষে স্কেটের লেখা 'মালয়ী জাদু' নামক গ্রন্থে ভারি চমৎকার একটা মালয়ী উপকথা আছে। উপকথা না বলে বরং লোককাহিনী বলাই ভালো। অনেক অনেকদিন আগে, তখন বন্দুকের প্রচলন হয়নি, লোকে তীর-ধনুক দিয়েই বাঘ শিকার করতো। সেই সময়ে একজন তরুণ মালয়ী আশ্চর্য রূপসী একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে। পূর্বরাগ দেখতে দেখতে অনুরাগে পরিণত হলো। এ ব্যাপারে ওদের বাবা-মারাও খুব একটা আপত্তি করলেন না, প্রজাপতির নির্বন্ধে ওদের বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পর দুজনে মহাসুখে ঘর-কন্না করতে লাগলো। কিন্তু ওদের এ সুখ দীর্ঘস্থায়ী হলো না। কয়েক মাস যেতে না যেতেই একদিন ভোরবেলায় বাঘে রূপসী বউটাকে মেরে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলো। লোকে সবে যখন বউটাকে খুঁজতে বেরুবে, এমন সময় বউটার স্বামী ফিরে এলো। সব শুনে সেও ওদের সঙ্গে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো। তারপর জঙ্গলের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে যখন বউটাকে দেখতে পেলো, তখন সে লোকজনদের মৃত বউ-টাকে ছুঁতে বারণ করলো, বললো—চলো, এখন আমরা ফিরে যাই, একটু পরে এসে আমি একাই বউটাকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। যার জিনিস সে যখন বলছে, ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়েই সবাইকে রাজি হতে হলো।

গ্রামে ফিরে এসে স্বামী বিয়ের সময়ের সুন্দর রঙিন জামাকাপড় পরে দুহাতে ধারালো দুটো ছুরি নিয়ে এক সময়ে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। তারপর জঙ্গলের মধ্যে যেখানে রূপসী বউটা পড়েছিলো সেখানে এসে বউটাকে নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে তার মৃতদেহটা দিয়ে নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণ ঢেকে মাটিতে শুয়ে পড়লো, শুধু বেরিয়ে

রইলো তার দুহাতের ছুরিদুটো। দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে এলো। সারা বন অন্ধকারে ঢেকে গেছে, আকাশে চাঁদ উঠছে। তারও অনেক পরে বাঘটা পায়ে পায়ে মরা বউটার দিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু যেই না বাঘটা সবে হাঁ করতে যাবে অমনি লোকটা ছুরি দুটো বাঘের গলার দুপাশে খুব জোরে বসিয়ে দিলো। বাঘ তো সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লো মাটিতে, আর লোকটা ছুরিদুটো বাঘের গলায় বেঁধা অবস্থাতেই সেখানে ফেলে রেখে বউটাকে কাঁধে করে নিয়ে ফিরে এলো গ্রামে।

এটাকে যদি নিছক একটা রূপকথা বলে উড়িয়ে দিই, এমন কোনো বাস্তব ঘটনা কিন্তু মালয়ে আদৌ বিরল নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা ঘটনার কথা জানি—একবার এক মালয়ী তার স্ত্রীকে নিয়ে হাট থেকে ফিরছিলো গ্রামে। একটু অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে একটা বাঘিনী অতর্কিতে আক্রমণ করলো তার স্ত্রীকে, সঙ্গে সঙ্গে সেই মালয়ীটাও ঝাঁপিয়ে পড়লো উদ্ধত বাঘিনীর ওপর। হাতে ছিলো ছোট একটা ছুরি, তাই দিয়েই সে সাচ্চা মরদের মতো একাই লড়ে গেলো বাঘিনীটার সাথে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত স্ত্রীকে কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচানো সম্ভব হয়নি, তবু একমাত্র গুরখা বা সাঁওতাল ছাড়া এমন দুঃসাহস ভারতবর্ষের নিরীহ গ্রামবাসীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। না, এটা শুধু একটা মাত্রই ঘটনা নয়—বর্শা, ছুরি, এমন কি খালি হাতেও হিংস্র শার্দূলের সাথে লড়ে যাওয়ার নজির মালয়ে ভুরিভুরি আছে।

বাঘ কেন মানুষ-খেকোয় পরিণত হয়—এ প্রশ্নের জবাব সম্ভবত উদ্ধৃতি থেকে সংক্ষেপে এইটেই বলা যায়, **"মানুষ সম্পর্কে সহজাত ভয়টা যখন তাদের আশ্চর্যরকম ভাবে কমে যায়, তখনই তারা সাধারণত মানুষ-খেকোয় পরিণত হয়।" ভারতবর্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যখন**

যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর টান পড়েছে তখন নানান পারি-পার্শ্বিকতার চাপে বাধ্য হয়ে বাঘ মানুষ মারতে শুরু করেছে। নানান পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তুটো কারণই সবচেয়ে প্রধান—হয় কোন রকম আহত হয়েছে, যখন স্বাভাবিক ভাবে শিকার মারার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, নয়তো চোখের দৃষ্টি হারিয়ে দাঁত-নখ ভেঙে বার্ধক্যের জন্যে প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছে। এরকম অবস্থায় সামান্য একটু ছলনার আশ্রয় নিয়ে নিরীহ অসহায় মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া বাঘের পক্ষে খুব একটা পরিশ্রমের কাজ কিছু নয়।

কিন্তু মালয়ের শিকার দফতরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, আশ্চর্য পাকা শিকারী এবং বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী লিওনার্দোর কাছে আমি শুনেছি—প্রাকৃতিক খাদ্য-সম্পদের অপ্রাচুর্যই মালয়ী বাঘের মানুষ-খেকোয় পরিণত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। জিম করবেট একজায়গায় মন্তব্য করেছেন—বাঘের বাচ্ছারা সাধারণত মানুষ-খেকোয় পরিণত হয় না। আমার ধারণা কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। কেননা মাত্র কয়েকটা ঘটনা ছাড়া আমার জানা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারাই মানুষ মেরেছে তারা বাঘিনী। শুধু বাঘিনীই নয়, মা-বাঘিনী। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের সঙ্গে তু-একটা বাচ্ছা থাকা আদৌ বিচিত্র কিছু নয়। বাচ্ছারা নিজে হাতে মানুষ না মারলেও মার সঙ্গে খাদ্যের ভাগ নেবে এইটেই তো স্বাভাবিক। মানুষের রক্ত-মাংসের স্বাদ পেতে পেতে ওদেরও রুচি যায় বদলে এবং মানুষ সম্পর্কে তখন ওদের ভয়টাও যায় অস্বাভাবিক ভাবে কমে। ত্রেনগান্নুতে আমি এমনও একটা ঘটনা জানি—যেখানে একজন রাখাল বালককে টেনে নিয়ে গেছে নিতান্তই একটা কিশোরী বাঘিনী।

লিওনার্দোর মতে মানুষ-খেকো বাঘকে সাধারণত তুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—এক যারা নিয়মিত মানুষ-খেকো, তুই যারা মাঝে মাঝে হঠাৎ করেই কখনও সখনও তু একটা মানুষ মারে। নিয়মিত মানুষ-খেকোদের মধ্যে আবার অধিকাংশই হয় আঘাতে পঙ্গু, না হয়তো বার্ধক্যের জন্যে অথর্ব যাদের পক্ষে মানুষ ছাড়া অন্য কোন জন্তু-জানোয়ার মারা আদৌ সম্ভব নয়। লিওনার্দোর ধারণা অন্যদের চাইতে এদের খুঁজে বার করা

অত্যন্ত সহজ। কেননা এরা যেমন হরিণ বা বুনো শুয়োরের পেছনে ধাওয়া করে এঁটে ওঠে না, তেমনি আবার শিকার মারার পর টানতে টানতে জঙ্গল ছেড়ে বেশি দূরে কোথাও যেতে পারে না। ফলে অন্যান্য মানুষ-খেকো বাঘদের খুঁজে বার করতে যখন নাকানি-চোবানি খেতে হয়, এদের ক্ষেত্রে সেই পরিশ্রমটা আবার বহুলাংশে যায় সুগম হয়ে।

লিওনার্দোর মুখেই শোনা একটা মানুষ-খেকো শার্দূলের কাহিনী—প্রায় বছর খানেক সময়ের মধ্যে আটজন মানুষ মেরেছে এমন একটা বিরাট বাঘকে লিওনার্দো যখন গুলি করে মারে, তখন সে ছিলো সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু ছাল ছাড়াবার সময় দেখা যায় বাঘটা কোন এক সময়ে রীতিমত আহত হয়েছিলো, এবং অনেকগুলো ছররা-গুলি তখনও তার মুখ ও কাঁধের চারপাশে বিঁধে ছিলো। যতদিন গুলি খেয়ে পঙ্গু হয়ে ছিলো, স্বাভাবিক ভাবেই বন্য জীবজন্তু মারা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই সময়ের মধ্যে বাধ্য হয়েই সে মানুষ মারতে শুরু করেছিলো। তারপর আহত বাঘটা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তখন থেকে আবার বন্য প্রাণী মারতে শুরু করে। মাঝখান থেকে মানুষ সম্পর্কে তার অহেতুক ভয়টাই যায় কেটে। ফলে যখনই অসহ্য খিদেয় ছটফট করতো কিংবা বনজ-প্রাণী সংগ্রহে কোথাও একটু-আধটু ভাটা পড়তো, অমনি মানুষ মারার প্রবৃত্তিটা তার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো।

আমি ভাল ভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি—আহত হবার পর যতগুলো বাঘই মানুষ-খেকোয় পরিণত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই আবার আহত হয়েছে স্থানীয় মালয়ীদের হাতের ছররা গুলিতে। ছাল না ছাড়ালে ওপর থেকে এইসব আঘাতের চিহ্ন কিছুই বোঝা যায় না। অথচ গুলি করার পর সীসের টুকরোগুলো শরীরে মাংসপেশীতে বিঁধেই থাকে, এবং রীতি-মত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। জেরানগাউর মানুষ-খেকোটাকে মারার পর লক্ষ্য করেছিলুম ওর ডানদিকের চোয়ালে ছররা গুলিতে বেশ ভালো মতোই কয়েকটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো। কেমাসেকের মানুষ-খেকোর পাঁজরাতেও বিঁধেছিলো বেশ কয়েকটা সীসের টুকরো।

মানুষের কাছ থেকে পাওয়া আঘাত ছাড়াও রয়েছে প্রাকৃতিক অ-

অক্ষমতা। যেমন সামনের শ্বদাঁত থেকে দু-একটা ভেঙে যাওয়া। শিকার ধরা এবং তাকে টেনে আনার পক্ষে এই শ্বদাঁতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। কেননা শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়েই বাঘ সাধারণত তার সুদীর্ঘ ধারালো এবং অত্যন্ত শক্তিশালী এই শ্বদাঁত দিয়েই ঘাড় কামড়ে ধরে, তারপর পেছনের পায়ে ভর রেখে ঘাড় কামড়ে ধরেই টানতে টানতে পেছু হটে। ফলে বার্ধক্যের জন্যে যদি এই শ্বদাঁতের দুএকটা পড়ে যায়, নড়ে যায়, কিংবা কোন কিছু আঘাতের ফলে খানিকটা করে ভেঙে যায়, তখন শিকার ধরার পক্ষে সত্যিই খুব অসুবিধে। ভেঙে যায় সাধারণত মারামারি কামড়া-কামড়ির সময়, নয়তো জোর করে দাঁত বসাতে গিয়ে শক্ত হাড়ে আঘাত লেগে। তাছাড়া বয়েসের জন্যে দাঁতের তীক্ষ্ণতা এমনিই অনেকটা কমে যায়, মাড়ি বা চোয়ালের জোর আসে শিথিল হয়ে। এসব ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক ভাবে শিকার ধরার ক্ষমতা যায় নষ্ট হয়ে।

প্রাকৃতিক কারণ বাদ দিলে, যদি বলি কোন বাঘ মানুষ-খেকোয় পরিণত হবার পেছনে মানুষই একমাত্র দায়ী, তাহলে বোধ হয় খুব একটা অত্যুক্তি কিছু হবে না। অন্তত মালয়ের ক্ষেত্রে তো নয়ই। আমি আগেও বলেছি, আবার বলতে চাই—নিতান্ত প্রয়োজন না হলে, অর্থাৎ কারুর গরু বাছুর মেরে তেমন কোন ক্ষতি না করলে, মারা বা আহত করা তো দূরের কথা, কোন বাঘকে অহেতুক ঘাঁটানোও উচিত নয়। আর যদি মারতেই হয়—ছররা গুলি দিয়ে নয়, রীতিমত প্রস্তুতি নিয়ে, অর্থাৎ বাঘে মারা কোন শিকারকে অনুসরণ করে বা তার সামনে মাচা বেঁধে কিংবা মাচার সামনে ছাগল ভেড়া জাতীয় কোন জ্যান্তো শিকারকে বেঁধে রেখে অথবা সুনির্দিষ্ট জায়গায় ওত পেতে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বাঘকে গুলি করে মারা উচিত। এবং গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মৃত্যু না হলে আহত বাঘটাকে খুঁজে বার করে তাকে মেরে তবে ছাড়া উচিত। প্রতি-কূল পরিবেশ বা কোন রকম সুযোগ সুবিধের অভাবে আহত বাঘকে খুঁজে বার করার কোথাও কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে বাঘ শিকারের কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া আদৌ উচিত নয়।

আহত অবস্থায় অবহেলিত বাঘ বা বাঘিনী মানুষের পক্ষে কি ভয়ঙ্কর

এবং কত হিংস্র হতে পারে অনেকেরই হয়তো সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণাই নেই।

আহত হওয়া ছাড়া কোন কারণে মানুষ সম্পর্কে সহজাত ভয়টা কমে গেলেও বাঘ দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারে এবং মানুষ মারতে শুরু করে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমি বলবো—খুব একটা বেশি না ঘাঁটিয়ে বাঘকে যদি একলা থাকতে দেওয়া যায় তাহলে আবার সে তার পুরনো স্বভাব ফিরে পাবে, অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কে তার সহজাত ভয়টা আবার ফিরে আসবে। অথচ বাঘ শব্দটা এমনই পিলে-চমকানো, তার চেহারা তার অস্তিত্ব তার উপস্থিতি এমনই আতঙ্কধরানো যে মানুষের মনে একবার ছাপ ফেললে তাকে মুছে ফেলা বা উপেক্ষা করা সহজে সম্ভব নয়। ফলে তাকে না মারা বা ভিটেমাটি থেকে সমূলে উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত মানুষের মনে কিছুতেই শান্তি নেই।

মালয়ে থাকাকালীন সমীক্ষা চালিয়ে আমি যেকটা মানুষ-খেকো বাঘের হিসেব নিতে পেরেছিলুম, তার মধ্যে দু একটা ছাড়া বাকি আর সবকটাই বাঘিনী এবং এদের মধ্যে আবার বেশির ভাগই মা-বাঘিনী। আমার ধারণা বাচ্ছাদের নিরাপত্তাই বোধ হয় এর একমাত্র কারণ। সদ্য-জাত বাচ্ছা বা বাচ্ছারা একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত মা-বাঘিনীর পক্ষে খুব বেশি দূরে কোথাও গিয়ে শিকার মারা সম্ভব নয়। তখন হাতের কাছের মানুষ মারা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। তাছাড়া বাচ্ছারা আক্রান্ত হলে মা-বাঘিনীর মতো এমন হিংস্র, ভয়াল জন্তুর কথা পৃথিবীতে কল্পনাই করা যায় না। এবং সেই আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা যদি আবার মানুষের দিক থেকে আসে তাহালে তো আর কথাই নেই। কিন্তু একটা ভারি মজার জিনিস আমি বহুবার লক্ষ্য করেছি—বাচ্ছাদের নিরাপত্তার জন্যে মা-বাঘিনী যখন কোন মানুষকে মারতে বাধ্য হয়, তখন মা-বাঘিনী বা তার বাচ্ছারা সেই মৃত মানুষটা খায় না বা ছোঁয়ও না। আসলে মানুষ

সম্পর্কে ভীতিটা তখনও তাদের মধ্যে কাজ করে, কেবল নিরাপত্তার সুনিশ্চিত বাধাটা দূর করতে পারলেই ওরা খুশি।

আমি নিজে এরকম দু দুটো ঘটনার কথা জানি, যেখানে মা-বাঘিনী শুধু বাচ্ছাদের বাঁচাবার জন্যেই মানুষ মারতে বাধ্য হয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার দু-ক্ষেত্রেই মা-বাঘিনী তার শিকার মারার চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী, অর্থাৎ হঠাৎ করে বিদ্যুৎ-বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার আসল-অস্ত্র দাঁত দিয়ে ঘাড় কামড়ে ধরার কোন রকম চেষ্টাই করেনি। কেবল থাবা চালিয়ে শত্রুর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, ঘাড় বা কাঁধের কাছে নখের আঁচড়ের দু-একটা দাগ পড়েছে। মৃত দুটো মানুষকেই ভালো করে, পরীক্ষা করে সারা শরীরে দাঁত বসানোর কোথাও কোন দাগ আমি খুঁজে পাইনি। এমনকি মারার পরেও ঘাড় কামড়ে না ধরে পিঠের কাছের মোটা কুর্তা কামড়ে ধরে বাঘিনী তাকে দূরে ফেলে দিয়ে এসে আপদ বিদেয় করেছে। খাওয়া তো দূরের কথা, মুখে করে বাঘিনী তাকে দূরে ফেলে দিয়ে আসার সময় ভয়ে বাচ্ছারা পর্যন্ত মাকে অনুসরণ করেনি। সাধারণত অমনটি কখনও হয় না, মা-বাঘিনী যেখানেই যায় বাচ্ছারাও মার পেছন পেছন তাকে অনুসরণ করে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, উভয় ক্ষেত্রেই হতভাগ্য দুজন ভুল করেই বাচ্ছা সমেত মা-বাঘিনীর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলো, এবং চোখের নিমেষে আলাই দূর করে দিতে মা-বাঘিনী কোথাও কোন দ্বিধা করেনি।

কার মুখে যেন একবার শুনেছিলুম—ছোট ছোট দুটো বাঘের বাচ্ছা কাকে নাকি একবার তাড়া করেছিলো। আমার ধারণার কথা অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা রটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা মানুষ সম্পর্কে ওদের এমনই ভীতি যে মারার পরেও ওরা যেখানে মাকে পর্যন্ত অনুসরণ করতে ভয় পায়, সেখানে ওরা কেমন করে একা একা কোন মানুষকে তাড়া করবে! তাছাড়া ওদের মা-ই বা কেন লোকটাকে শুধুমুধু ছেড়ে দেবে? বাচ্ছাদের ছেড়ে ওদের মার তো খুব একটা বেশি দূরে কোথাও থাকার কথা নয়।

একবারের একটা ঘটনা বলি। ঘটনাটা ঘটেছিলো আমার বাসার

খুব কাছেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ঘটনাটা শুনেছিলুম আক্রান্তকারী এক মালয়ীর মুখে। সেদিন সে মাঠে হাল দেওয়ার কাজ শেষ করে তাগড়াই মোষটাকে নিয়ে ফিরে আসছিলো গ্রামে। সামনে বড় বড় ঘাসে ছাওয়া বিরাট একটা মাঠ। বেলা-শেষের সূর্যটা তখন সবে ঢলতে শুরু করেছে পশ্চিমের আকাশে। গোধূলিবেলার রাঙা আলোয় রঙিন হয়ে রয়েছে সারা আকাশ। হালের মোষটাকে নিয়ে মেঠো পথ দিয়ে লোকটা সবে যখন একটা গাছের তলায় এসে পৌঁচেছে, অমনি একটা বাঘিনী লোকটাকে আক্রমণ করলো। ছোট একটা বাচ্ছাকে নিয়ে বাঘিনীটা শুয়েছিলো বড় বড় ঘাসের মধ্যে গাছের ছায়ায়। বাচ্ছাটাকে ভয় পেতে দেখেই সম্ভবত বাঘিনী সতর্ক হয়ে উঠেছিলো। না, ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়েনি, পেছনের পায়ে ভর রেখে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ গর্জন করে সামনের থাবার নখ দিয়ে মুখ পিঠ ঘাড় আঁচড়ে ফালা ফালা করে দিলো। মনিবের ভয়ার্ত চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে প্রকাণ্ড শরীর ঘুরিয়ে ভয়ঙ্কর শিঙ নেড়ে মোষটাও সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনীটাকে আক্রমণ করলো। বাঘিনীও চকিতে লোকটাকে ছেড়ে মোষটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলো। কিন্তু তার আগেই মোষটা শিং দিয়ে বাঘিনীকে মাটিতে উলটে ফেলে দিয়েছে, আর বাঘিনী সেই অবস্থাতে আকাশের বুক চিরে প্রচণ্ড গুরু গম্ভীর গর্জনে মোষটার টুঁটি কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে। মোষটা শিং দিয়ে বাঘিনীটাকে মাটির সঙ্গে এমনভাবে ঠেসে ধরেছে যে বেচারি কিছুতেই সুবিধে করতে পারছে না। বাচ্ছাটা বার বার মোষটার ঘাড় কামড়ে ধরে মাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে, কিন্তু অনভিজ্ঞতার ভয়ে সে বার বার পেছিয়ে আসছে। অথচ মিনিট খানেক কি মিনিট দুয়েক পরেই দেখা গেলো বাঘিনী মোষটাকে ঘাসের ওপর উলটিয়ে ফেলে তার ঘাড় কামড়ে ধরেছে। সত্যি, আক্রান্ত বা আহত হলে বাঘ যে কি ভয়ঙ্কর শক্তির অধিকারী হতে পারে কারুর কোন ধারণাই নেই। কয়েকটা ঝটকাতেই অতবড় তাগড়াই মোষটার অবস্থা তখন কাহিল। টুঁটিটা সম্ভবত আগেই ছিঁড়ে দিয়েছিলো—গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে। পরে দেখেছিলুম জিভ বার করে চোখ উলটিয়ে মরে পড়ে-থাকা মোষটার

চারপাশে শুধু চাপচাপ পুরু রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে রয়েছে। ইতিমধ্যে বাঘিনীর ক্রুদ্ধ গর্জনে আর লোকটার ভয়ার্ত চিৎকারে আশপাশের লোক-জন সব ছুটে আসে। তার আগেই বাঘিনী মোষটাকে সাবাড় করে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

স্থানীয় মালয়ীরাই ব্যবস্থাপত্তর করে আহত লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রচুর রক্তপাতের ফলে লোকটা পথেই অজ্ঞান হয়ে যায়। পরে আমি তাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলুম। শরীরের ঊর্ধ্বাংশে চোখ ছাড়া আর সব জায়গায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জ্ঞান হবার পর তার মুখেই আমি এই কাহিনী শুনেছিলুম। বলতে বলতে আতঙ্কে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বেশ কয়েক বোতল রক্ত দেওয়া সত্ত্বেও লোকটাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। একদিক থেকে অবশ্য ভালই হয়েছে, বাঁচলেও সারাজীবন লোকটা হয়তো অতঙ্কে পাগলই হয়ে যেতো।

সঙ্গে ছোট বাচ্ছা থাকলে সতর্ক পাহারা দেওয়া ছাড়াও ঋতুমতী হলে,

বিশেষ করে ঠিক যে সময়ে সঙ্গীর প্রয়োজন সেই সময়ে কোন বাঘের দেখা না পেলেও বাঘিনী ভয়ঙ্কর নৃশংস হয়ে উঠতে পারে। তখন শুধু আকস্মিকভাবে তার কাছাকাছি কেউ এসে পড়লে বা ওদের দুজনকে বিশেষ অবস্থায় দেখলেই যে বাঘিনী মানুষকে আক্রমণ করে তাই নয়, সে সময়ে ওরা সাধারণত কোন অযাচিত বস্তুকেও ঠিক সহ্য করতে পারে না।

কেমামানে থাকার সময়ে আমি এরকম ভারি অদ্ভুত দুটো মজার ঘটনা জানি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বাঘের দেখা না পেয়ে বাঘিনীর মেজাজ সপ্তমে চড়ে যাওয়াই ছিলো এর প্রধান কারণ। একবার একটা ক্রুদ্ধ বাঘিনীকে যাত্রী-বোঝাই একটা বাসকে প্রায় আধ মাইল পথ দৌড়ে অনুসরণ করতে দেখেছিলুম। কেমামানে তখন সবে

এসেছি, বাঘের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কিছুই বুঝি না। বাসের যাত্রীদেরই এ সম্পর্কে বলাবলি করতে শুনেছিলুম। আর দ্বিতীয় ঘটনাটা, ট্রাক-বোঝাই সশস্ত্র পুলিসবাহিনী একবার যখন সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মোকা-বিলা করতে যাচ্ছিলো, সেই সময় একটা ক্রুদ্ধ বাঘিনী ঠিক একই ভঙ্গীতে তাদের অনুসরণ করেছিলো। অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই বাঘিনী ছুটো গাড়ি ছুটোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারেনি, কেননা ক্রুদ্ধ গর্জনরত বাঘিনীর সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে গাড়ির চালকরা কোথাও না থেমে উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছিলো। ফলে ওদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিলো কিছুই জানা সম্ভব হয়নি।

সত্যিকারের অভিজ্ঞ শিকারী মাত্রই স্বীকার করেন আহত শার্দুলের চেয়ে ভয়ঙ্কর জন্তু যেমন নেই, ঠিক তেমনি আবার আহত হলেই যে বাঘ সবসময় মানুষ মারবে এমনও কোন যথেষ্ট যুক্তি নেই—তা সে অতর্কিতেই কেউ তার কাছে এসে পড়ুক কিংবা আহত বাঘটাকে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করেই কেউ তার মুখোমুখি হয়ে যাক। ছুটো ঘটনার কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে, যেখানে ছুটো বাঘই গুলি খেয়ে আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়। তারপর সেই অন্ধকার রাত্তিরেই পায়ের ছাপ অনুসরণ করে খুঁজতে খুঁজতে টর্চের আলোয় এক সময় স্পষ্ট দেখি যাকে খুঁজছি সেই আহত বাঘের মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। অথচ কোন ক্ষেত্রেই বাঘছুটো এমন কোন মারাত্মকরকম ভাবে জখম ছিলো না যে ইচ্ছে করলে আক্রমণ করতে পারতো না। কিন্তু করেনি, এইটেই ঘটনা। উভয় ক্ষেত্রেই গুলি করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আহত বাঘছুটোকে খুঁজতে শুরু করেছিলুম। শিকারীদের অনেকেই হয়তো বলবেন—আহত হবার পর অসহ্য যন্ত্রণায় সে তখন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলো, নিজেকে সামলে নেবার সে কোন অবকাশই পায়নি। অনেকে আবার গুলি করার পর কম করেও মিনিট ত্রিশেক সময় বিরতি দিয়ে তবে খুঁজতে শুরু করা উচিত বলে মনে করেন। সম্ভবত আহত বাঘের প্রচণ্ড হিংস্রতার কথা স্মরণ রেখেই তাঁরা এই উপদেশের পক্ষপাতী। কিন্তু ভয়ঙ্কর হিংস্র হওয়া সত্ত্বেও ছুঃসহ যন্ত্রণার কথা স্মরণ রেখে আমি বরং সাথে সাথেই অনুসন্ধানের বেশি পক্ষপাতী।

তাছাড়া ভারি বুলেটে মারাত্মকভাবে জখম হলে যেসব ক্ষেত্রে জিব দিয়ে চেটেচুটে নিজেদের গভীর ক্ষত সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এইসব জখমি-বাঘ মানুষের পক্ষে মারাত্মক রকম ক্ষতিকারক হতে পারে। এ সম্ভাবনার কথা মনে রেখে আমি বরং সাথে সাথেই অনুসন্ধানের বেশি পক্ষপাতী।

ওপরে উল্লিখিত দুটো আহত বাঘ প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ১৯৫১ সালের ২৬শে আগস্টে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রে 'মালয়ের মানুষখেকো বাঘ' প্রবন্ধের তুলনামূলক বিচার করে দেখা যাক। এই প্রবন্ধে একজন পোড়-খাওয়া ঝানু শিকারী লিখেছেন :

"আহত বাঘ কোন মানুষ দেখা মাত্রই তাকে আক্রমণ করবে, এমন কি ক্ষত সেরে যাবার দীর্ঘদিন পরেও।"

হ্যাঁ, কথাটা অবিসংবাদিতভাবে সত্যি—আহত কোন বাঘ নিরীহ মানুষের পক্ষে মারাত্মক রকমের বিপজ্জনক, কিন্তু তা বলে এই নয় আহত বাঘ মাত্রই মানুষ দেখলেই তাকে আক্রমণ করবে। সাধারণভাবে কথাটা প্রযোজ্য হলেও, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে যুক্তি-তর্ক দিয়ে কোন বাঘের স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণকে সুনির্দিষ্ট ছকে বেঁধে বিশ্লেষণ করা আদৌ কোনদিন সম্ভব নয়। আসলে তা নির্ভর করে বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বাঘ বা বাঘিনীর মেজাজ, নানান প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বিশেষ পরিপার্শ্বিকতার ওপর।

একটা প্রশ্ন আমাকে মাঝে মাঝে প্রায়ই করা হয়—মালয়ের গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে ঘুরে-বেড়ানো কমিউনিস্টদের কখনও বাঘে আক্রমণ করে না? করে কি না ঠিক জানি না, তবে আমি যতটুকু জানি অন্তত করেনি। কেননা আমি ওদের মৃত্যু সংবাদ কখনও পাইনি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমন কি ওদের শত্রুরা কখনও এ সম্পর্কে পুলিসে কোন অভিযোগ করেনি কিংবা হাসপাতালেও এমন কোন আহত ব্যক্তিকে ভর্তি করানো হয়নি। সুতরাং এক কথায় এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব দেওয়া সত্যিই খুব কঠিন। তবু এ প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা ঘটনা বলি যার সত্যতা বিচারের ভার সম্পূর্ণ পাঠকের ওপর, আমি নিজে কোন মতামত প্রকাশ

করবো না। যখন কেমাসেকের মানুষ-খেকো শার্দূলটাকে মারার তোড়-জোড় করছি, দেখলুম একজায়গায় খানিকটা বাঘের বিষ্ঠা পড়ে রয়েছে, তার আশেপাশে যে কটা পায়ের ছাপ রয়েছে কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটার পায়ের ছাপের সঙ্গে তার হুবহু মিল রয়েছে। অর্থাৎ সেটা যে কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘেরই বিষ্ঠা তা বুঝতে আমার আগেই কোন অসুবিধে হয়নি। সেই বাঘের বিষ্ঠার সঙ্গে মিশে রয়েছে দেখলুম মানুষের পায়ের গোড়ালির সামান্য খানিকটা মোটা চামড়া। অথচ আশ্চর্য, দু-একদিনের মধ্যে আশেপাশের অঞ্চল থেকে কোন মৃত্যুসংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁছোয়নি। এই ঘটনার আট দিন পর কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটাকে গুলি করে মারা হয়েছিলো।

বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে মানুষ-খেকো বাঘ সাধারণত দিনের বেলাতে শিকার মারে, শিকার বলতে আমি অবশ্য এখানে মানুষের কথাই বলতে চাইছি। ফলে দিনের আলোয় যাঁরা শিকার করতে ভালবাসেন, তাঁদের পক্ষে মানুষ-খেকো বাঘ গুলি করে মারা কিছুটা সুবিধাজনক বলে মনে হতে পারে। কেননা শুধু যে তাদের দিনের বেলায় দেখা যায় বলেই নয়, মানুষ সম্পর্কে তাদের সহজাত ভয়টাও যায় অনেকটা কমে। ফলে কাছে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা অন্যান্য স্বাভাবিক বাঘের মতো চকিতে মানুষকে আক্রমণ করে বসে না। ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেদের যতটা সম্ভব অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে আত্মগোপন করে রাখতে, এবং শিকারী খুব কাছাকাছি এসে পড়লেও নিজেদের নিশ্চলভাবে ধরে রাখতে। আপাত দৃষ্টিতে মানুষ-খেকো বাঘ-শিকারীদের কাছে এগুলো মোটামুটি বেশ সুবিধেজনক পরিস্থিতি মনে হলেও, সত্যিকারের মানুষ-খেকো বাঘকে খুঁজে বার করা, তাকে গুলি করে মারা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তার জন্যে

চাই নিপুণ অভিজ্ঞতা, চোখ-কান খোলা অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি, অসীম ধৈর্য আর দুর্জয় সাহস। আমার ব্যক্তিগত ধারণা একাধারে এই চারটি গুণের সমন্বয় না ঘটলে মানুষ-খেকো বাঘ শিকার করা নিতান্তই স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শুধু এইটুকুই বলতে পারি—ত্রেনগান্নুর যে দুটো উল্লেখযোগ্য নর-খাদককে আমি গুলি করে মেরে-ছিলুম, আগাগোড়া ওরা আমাকে বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়েছিলো। শুধু বুদ্ধুই নয়, আমাকে রীতিমত ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো। সে সময়ে আমি মনে মনে নিজেকে একজন কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিতে বাধ্য হয়েছিলুম।

মালয়ে মানুষ-খেকো বাঘের সবচেয়ে সুবিধে রাস্তাঘাট। বিশেষ করে ত্রেনগানুতে প্রধান সড়কের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাও আবার যেকটা আছে তার অধিকাংশই চলে গেছে জঙ্গলের বুক চিরে, না হয় তো এক-পাশে ঘন অরণ্য অন্যপাশে দীর্ঘ সমুদ্র-সৈকত। সুতরাং সাধারণত যাঁরা পায়ে হেঁটে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, বাঘের পক্ষে নিঃশব্দে তাঁদের অনুসরণ করা খুবই সহজ এবং ঝোপ বুঝে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া আদৌ কিছু কঠিন নয়। তার ওপর, এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাওয়ার এবং মাঠ থেকে ঘরে ফিরে আসার প্রায় সব পায়ে-চলা পথই চলে গেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে পথগুলো এমন সরু যে একজনের বেশি লোক পাশাপাশি চলতে পারে না, ঝোপঝাড় লতাপাতা বড়বড় গাছের ডালপালায় পথগুলো এমন ভাবে ঢেকে থাকে যে দিনের বেলাতেও একা চলতে গেলে গা ছমছম করে। তবু প্রয়োজনের তাগিদে গ্রামবাসীদের পক্ষে এইসব পথ এড়িয়ে চলা কোন মতেই সম্ভব নয়। এ তো গেলো পথের ব্যাপার। মালয়ে মানুষ-খেকো বাঘের দ্বিতীয় সুবিধে —মেয়ে-পুরুষ অধিকাংশ মালয়বাসীরাই রবার-বাগিচার কাজ করে। প্রথমত গ্রাম থেকে রবারের বাগিচাগুলো বেশ দূরে দূরে এবং জঙ্গলের মধ্যে। বাগিচাগুলোর ভেতরের ঝোপ-ঝাড় চেষ্টা করলে হয়তো কিছুটা পরিষ্কার রাখা যায়, কিন্তু আশেপাশের ঘন জঙ্গল তো আর পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। ফলে জঙ্গল পেরিয়ে গুড়ি মেরে রবার-বাগিচায় প্রবেশ করা বাঘের পক্ষে খুবই সহজ কাজ। দ্বিতীয়ত একটা গাছ থেকে আর

একটা রবার গাছের দূরত্ব এবং গাছ থেকে রবার সংগ্রহ করার পদ্ধতি, অর্থাৎ রবার-সংগ্রকারীর একাকিত্ব এবং একাগ্রতার সুযোগ নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া নর-মাংস-লোলুপ শার্দূলের পক্ষে তেমন কিছু বিচিত্র নয়।

আত্মগোপন করে নিঃশব্দ পায়ে সোজা শিকারের দিকে এগিয়ে আসুক বা রক্ত-হিম-করা ভয়ঙ্কর গর্জনে তাকে আক্রমণই করুক, উভয় ক্ষেত্রেই বাঘ সাধারণত পেছনের পায়ের ওপর ভর রেখে সামনের পায়ের থাবা-ছুটো বাড়িয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে পেছন থেকে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর ওপর আর নিচের অত্যন্ত ধারালো এবং দীর্ঘ শ্বদাঁত দিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে শিকারের ঘাড় কামড়ে ধরে। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত মানুষের পক্ষে সাথে সাথেই মৃত্যু ঘটে। এরকম কয়েকটি মৃতদেহ আমি লক্ষ্য করে দেখেছি—পিঠে, কাঁধের ছুপাশে, এমন কি চিবুকেও আমি গভীর নখের দাগ লক্ষ্য করেছি, আর পেছন থেকে ঘাড়টা কামড়ে ধরা হয়েছে সাধারণত একটু বাঁ-দিক চেপে।

মারার পর শুরু হয় উপযুক্ত কোন জায়গায় শিকারকে টেনে নিয়ে চলার পালা, যেখানে মোটামুটি নির্বিঘ্নে এবং পরম তৃপ্তিতে ভোজপর্বটা সমাধা করতে পারে। আমি অবশ্য কখনও দেখিনি বা শুনিনি মানুষ-খেকো বাঘ শিকার মেরে সেখানেই খেয়ে চলে গেছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছে সুদীর্ঘ পথ শিকার টেনে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই মৃতদেহ থেকে খানিক খানিকটা করে খেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে এর যুক্তিসংগত ছুটো কারণ থাকতে পারে। হয় উপযুক্ত কোন নিভৃত আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার আগেই সে অসহ্য খিদেয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো, না হয়তো খাওয়া শেষ করার আগেই মানুষের পায়ের শব্দে সতর্ক হয়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে কোথাও আত্মগোপন করেছিলো। তারপর আপদ বিদেয় হতেই আবার শিকারকে মুখে করে অন্য কোথাও টেনে নিয়ে গিয়ে ভোজপর্ব শেষ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন বিঘ্ন একাধিকবারও ঘটতে পারে। কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটা একবার আমাকে ঠিক এমনিভাবে দেড় মাইল পথ নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিলো।

প্রতিবারেই সে এক একটা মৃতদেহকে খানিকটা করে টেনে নিয়ে গেছে, খানিকটা করে খেয়েছে। তারপর যখনই লোকজনের পায়ের শব্দ পেয়েছে মুখের শিকার ফেলে রেখে গা ঢাকা দিয়েছে, আর মাঝে মাঝে আকাশের -বুক-কাঁপানো ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জনে আমাদের পিলে চমকে দিয়েছে। শেষে অবশ্য মৃতদেহটা না খেয়ে প্রায় বিরক্ত হয়েই শিকার ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলো। সেবারের মতো তাকে গুলি করে মারার কোন সুযোগই আমি পাইনি।

শিকার মারার পর মালয়ের মানুষ-খেকো বাঘ সাধারণত ভারত-বর্ষের মানুষ-খেকো বাঘের মতো উঁচু করে তুলে নিয়ে যায় না, ঘাড় কামড়ে ধরে প্রায় সম্পূর্ণটাই টানতে টানতে নিয়ে যায়। বহু ক্ষেত্রেই মালয়ের মানুষ-খেকো বাঘ সাধারণত শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ার পর প্রথম যে ভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ঠিক সেই অবস্থাতেই শিকারকে টানতে টানতে বহু দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। অবশ্য কোন বাঁধাবিঘ্ন ঘটলে আলাদা কথা। কেননা ঘাড়ের কামড় পরিবর্তন করলে, শিকার টেনে নিয়ে-যাওয়ার-পথে রক্তের প্রাচুর্য দেখে স্পষ্টই তা বোঝা যেতো। নাহলে সাধারণত নিহত মানুষের ঘাড় বেয়ে পিঠ পেরিয়ে হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের পাতা কিংবা গোড়ালি চুঁইয়ে ক্ষীণতুটো রক্তের ধারা প্রায় সারা পথেই খুঁজে পাওয়া যেতো। আর ভয়ঙ্কর দুর্গম পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় কাঁটায় খোঁচাখুঁচি লেগে বা সাধারণত নিহত মানুষের পরনে জামা-কাপড়ের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যেতো না, যাকিছু পাওয়া যেতো নিচু নিচু ঝোপঝাড়ে আর আটকে-থাকা কাঁটাগুল্মের মাঝে।

স্বভাব-চরিত্র বা আচার-আচরণ ছাড়াও শিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতেও সাধারণ বাঘের সঙ্গে মানুষ-খেকো বাঘের কিছুটা তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় বইকি। মানুষ-খেকো বাঘের শিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিকে সুশৃঙ্খল কোন নিয়মের আওতায় ফেলা যায় না, বরং বলা যায় কিছুটা এলোমেলো। আসলে এতদিন লুকিয়ে-চুরিয়ে গরু-ছাগল মেরে আসা তথাকথিত নিরীহ বাঘটা হঠাৎ করে মানুষকে আক্রমণ করতে শুরু করায় নিজের মধ্যে সহজাত একটা অপরাধবোধ কাজ করে।

ফলে সাধারণত সে চেষ্টা করে যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি দূর পর্যন্ত নিহত মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে এবং যতক্ষণ না উপযুক্ত কোন নিভৃত আশ্রয় খুঁজে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত শিকারকে টানতে টানতে নিয়ে যায় গভীর জঙ্গলে।

জেরানগাউ-এর মানুষ-খেকো বাঘটা একবার একজন চীনা রবার-সংগ্রহকারীর মৃতদেহটাকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এসে ছোট একটা নদী পেরিয়ে অন্য পারে নিয়ে যায়। তাতেও সে ক্ষান্ত হয়নি, বাঁদিকে মোড় নিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নদী পেরিয়ে বাঘটা আবার জঙ্গলে ফিরে এসেছে। তারপর ছোটমতন একটা জলার ধারের নিরিবিলি একটা জায়গা বেছে নিয়ে তবে সে মৃতদেহটাকে সাবাড় করেছে। অথচ আশ্চর্য, প্রায় মাইল দুয়েক পথ অতিক্রমণ করে যেখানে সেই চীনা রবার-সংগ্রহকারীটাকে সে মেরেছিলো তার থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে বসে মৃতদেহটাকে শেষ করেছে। আমি জানি না এটা ইচ্ছাকৃত, না অনুসরণকারীদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যেই সে এমন আচরণের আশ্রয় নিয়েছিলো। কেননা কোন মানুষ-খেকো বাঘ যখন বুঝতে পারে কেউ তার পেছনে লেগেছে, তখন সে সাধারণত চেষ্টা করে উভয় পক্ষের মধ্যে দূরত্বটা উত্তর-উত্তর বাড়িয়ে নিয়ে যেতে, এবং এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যখন রাত্রি হওয়ার আগে পর্যন্ত আর তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এবং রীতিমত দুঃসাহসী পাকা শিকারী মাত্রই জানেন রাত্তিরে মানুষ-খেকো বাঘকে অনুসন্ধান করা মানেই কি অসম্ভবরকমের ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি নেওয়া।

বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে না গিয়ে মোটামুটি ভাবে বলতে পারি মানুষ-খেকো বাঘ সাধারণত মানুষের পায়ের, বিশেষ করে পাছা বা উরুর দিক থেকে খেতে শুরু করে। জেরানগাউর মানুষ-খেকো বাঘের মারা একটা মৃতদেহকে আমি বাঁ পায়ের দাবনার দিক থেকে খাওয়া

অবস্থায় দেখেছিলুম। অথচ কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটা বরাবরই ডান পায়ের দিক থেকে খাওয়া শুরু করতো। কিন্তু ডান হোক আর বাঁ-ই হোক, কোন ক্ষেত্রেই এই ভয়াবহ অভ্যেসের ব্যতিক্রম আমি কোথাও কোন দিন লক্ষ্য করিনি। মালয়বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস কোন মৃতদেহ চিত হয়ে পড়ে থাকলে মানুষ-খেকো বাঘ তার ধারে কাছেও ঘেঁষে না, কেননা ওরা নাকি মানুষের মুখের দিকে তাকাতে ভয় পায়। স্পষ্টই বলি, আমি এ কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। তাই ওদের কোন দিন জিগেস করিনি —কোন্ মানুষের মুখের দিকে তাকাতে ওরা ভয় পায়? জীবিত না মৃত? আসলে মৃত মানুষটা চিত হয়ে পড়ে রয়েছে না উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে, ভয়ঙ্কর হিংস্র নর-খাদকের কাছে সেটা কোন ঘটনাই নয়। বাঘ সাধারণত পেছনের থেকেই মানুষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। তা সে ঘাড় কামড়ে ধরতে পারুক বা না-ই পারুক, ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন প্রকাণ্ড একটা শরীরের ভারেই মানুষ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। তারপর ঘাড় কামড়ে ধরে নিয়ে যাবার সময় সারাক্ষণ তার মুখটা ঝুলে থাকে নিচের দিকেই। ফলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকার ঘটনাটা পারতপক্ষে ঘটেই না, আর ঘটলেও তা অত্যন্ত বিরল। অন্তত আমার নিজে চোখের সৌভাগ্য কখনও হয়নি।

মানুষ-খেকো বাঘের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে এমন মানুষের সংখ্যা সত্যিই খুব দুর্লভ। কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটা প্রথম মানুষ মারে ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরে, দ্বিতীয় মানুষ মারে ঠিক তার এক বছর বাদে ১৯৫০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরে। প্রথমবার যাকে আক্রমণ করে সে ছিলো একজন চীনা রবার-সংগ্রহকারী। দিনের বেলাতেও মাথায় ছোট লণ্ঠন বেঁধে চীনারা যেভাবে রবার সংগ্রহ করে ও-ও ঠিক সেই ভাবে রবার সংগ্রহ করছিলো। ওর বউও কাজ করছিলো খানিকটা দূরে। কোন বাগিচায় রবার-সংগ্রহকারীরা সাধারণত মুখে একরকম উৎকট শব্দ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরস্পরের কাছে সংকেত পাঠায়, যাতে কোথাও কোন অঘটন ঘটলে ওরা চট করে বুঝতে পারে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উভয় রবার-সংগ্রহকারী সংকেতের প্রত্যুত্তরে জবাব না দিলেই ধরে নিতে হবে তাকে বাঘে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই

দুর্ঘটনার খবর পৌঁছে দেওয়া হয় বাগিচার এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে, এবং তখনই শুরু হয়ে যায় তল্লাসির পালা।

এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটলো। সংকেতের কোন জবাব না পেয়ে চীনা বউটা চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলে দৌড়ে চললো কি ঘটেছে দেখতে। রক্তের দাগ আর পায়ের ছাপ দেখে তো তার চক্ষু স্থির। তবু কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বিপদ-সূচক সংকেত পাঠালো বাগিচার অন্য প্রান্তে। দেখতে দেখতে লোকজন সব হাজির হলো, দল বেঁধে সবাই বেরিয়ে পড়লো খুঁজতে। সৌভাগ্যক্রমে বেশিক্ষণ তাদের খোঁজাখুজি করতে হয়নি, খানিকটা দূরেই একজন দোস্ত দেখতে পেলো অবচেতন চীনাটার একটা পা ঝোপের আড়াল থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হলো। কিন্তু ঘাড়টা তখন তার সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। অনেক সময় দেখা যায় বাঘে টেনে নিয়ে যাবার সময়েও আক্রান্ত ব্যক্তি তখনও বেঁচে রয়েছে। আরও খানিকটা টেনে নিয়ে যাবার অবকাশ পেলে হয়তো ও পথেই মারা যেতো কিংবা মারা না গেলেও তাকে মেরে তবে বাঘ তাকে খেতো। এক্ষেত্রেও চীনা রবার-সংগ্রহকারীটা দুদিন বেঁচে ছিলো। কিন্তু আমি যখন তাকে হাসপাতালে দেখতে যাই, ক্ষতস্থান বিষিয়ে গিয়ে সে তখন মারা গেছে। আসলে ক্ষতস্থান বিষিয়ে গেলে, বিশেষ করে এই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে কাউকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। আমি শুনেছি, ঠিক জানি না, সম্ভবত বাঘের চোয়ালে দাঁতের চারপাশে একরকমের বিষাক্ত লালা থাকে যা এই পচনকে তরান্বিত করতে বিশেষ সাহায্য করে।

ভারতবর্ষের তুলনায় মালয়-উপদ্বীপে মানুষ-খেকো বাঘের বিচরণ-ক্ষেত্রের পরিধি অত্যন্ত সীমিত হলেও, এইসব হিংস্র জানোয়ারদের গুলি করে মারা অত্যন্ত কঠিন। জিম করবেটের 'কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ' বইটা পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়—কোন মানুষ-খেকো বাঘকে মারার সময় উনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনতার সুযোগ পেতেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঘে-মারা-শিকারটাকে, তা সে মানুষ অথবা পশুই হোক, কোথাও সরিয়ে নেওয়া হতো না। রুদ্রপ্রয়োগের চিতাটাকে মারার পরিকল্পনা-

কালে মৃত-মানুষটার দেহে তিনি বিষ প্রয়োগ করেছিলেন যাতে তার মাংস খাবার পর চিতাটা মারা যায়। একবার অন্য একটা ঘটনায় চিতায় মারা একটা কিশোরের মৃতদেহটাকে তিনি লোহার শেকল দিয়ে উঠোনে বেঁধে রেখেছিলেন যাতে রাত্তিরে ফিরে এসে আবার তাকে খেতে পারে। কিন্তু মালয়ে এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করার কোন প্রশ্নই আসে না। এখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৃতদেহকে কবর দিতে হয়।

জেরানগাউর মানুষ-খেকো বাঘটাকে যতবারই গুলি করে মারার চেষ্টা করেছি, ততবারই অকুস্থানে এসে পৌঁছনোর আগেই মৃতদেহটাকে সেখান থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কোনবারেই মৃত শিকারটাকে দ্বিতীয়বার বাঘে খাওয়ানোর এতটুকু সুযোগ পাইনি। মানুষ-খেকো কোন বাঘকে গুলি করে মারতে গেলে এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার—বাঘকে কোথাও এতটুকু বোঝবার অবকাশ না দিয়ে বাঘ যেখানে মৃত শিকারটাকে ফেলে গিয়েছিলো মৃতদেহটাকে সেখানেই ফেলে রাখতে হয় যাতে পরের বারে নির্দ্বিধায় ফিরে এসে সে মৃতদেহটাকে খেতে পারে। স্বেচ্ছায় নয়, ভয়ে পড়ে, জেরানগাউর মানুষ-খেকো বাঘের উৎপাতে তিতিবিরক্ত হয়ে স্থানীয় মালয়বাসীরা যখন আমাকে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ দিলো, তখনই আমি সেই সুচতুর মানুষ-খেকো বাঘটাকে তার মারা শিকারের কাছে এসে পৌঁছনোর আগেই গুলি করে মারতে পেরেছিলুম।

মালয়ে কোন মানুষ-খেকো বাঘ মানুষ মারলে প্রায় সাথে সাথেই খবর পাওয়া যায়। কেননা মালয়ীরা সাধারণত দল বেঁধে কাজ করে, দল বেঁধেই নির্জন বনের পথে যাতায়াত করে। আতঙ্কিত সঙ্গীর আর্তনাদে কিংবা সংকেতের জবাব না পেলে সবাই মিলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে

দেয়। এসব ব্যাপারে ভারতবর্ষের গ্রামবাসীর তুলনায় ওরা অনেক বেশি দুঃসাহসী। সশস্ত্র পুলিসবাহিনীও এ ব্যাপারে গ্রামবাসীদের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা করে। একবার সন্ত্রাসবাদী-প্রতিরোধবাহিনীর একজন পুলিস করপোরাল সামান্য একটা পিস্তল নিয়েই মানুষ-খেকো একটা বাঘিনীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হয় যারা ঐ মানুষ-খেকো বাঘটাকে খুঁজতে বেরোয় তাদের নিয়ে। মৃতদেহটা খুঁজে পেলে তো কোন কথাই নেই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া ঝোপঝাড় তোলপাড় করে, মানুষের পায়ের ছাপে মানুষের গায়ের গন্ধে সমস্ত স্বাভাবিক পরিবেশকে এমন লণ্ডভণ্ড করে তোলে যে বাঘ খুব সহজেই বুঝতে পারে কেউ তার মারা শিকারটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কেননা বাঘে-মারা শিকারকে সাধারণত অন্যকোন পশু খেতে বা টেনে নিয়ে যেতে সাহস করে না। বাঘ বুঝতে পারে শুধু মৃতদেহটাকে সরিয়েই নিয়ে যাওয়া হয়নি, তাকে মারার জন্যে তার পেছনেও লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে সতর্ক হয়ে যায়। তখন মানুষ বা অন্যকোন পশু মারা তো দূরের কথা, বাঘ সাধারণত চেষ্টা করে তার বিচরণ-ক্ষেত্র ছেড়ে দূরের দিকে কোথাও সরে পড়তে। ফলে এসব ক্ষেত্রে কোন মানুষ-খেকো বাঘকে বাগে আনা খুব কঠিন। তখন নতুন করে অন্যকোন শিকার না মারা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই থাকে না।

এই প্রসঙ্গে, তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে যে নির্মম সত্যটা উপলব্ধি করেছি —সাময়িকভাবে বিরতি দিলেও অরণ্যের সম্রাট একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে ভবিষ্যতে মানুষ সে মারবেই। তাই যেখানে যতবারই কোন মৃতদেহকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, মনে মনে আমি মর্মাহত হয়েছি সব-চেয়ে বেশি। কেননা আমি ভাল করেই জানি—ভবিষ্যতে এর মূল্য দিতে হবে আরও কয়েকটি অমূল্য জীবন বলি দিয়ে। তাই যখনই খবর পেয়েছি কোন বাঘ মানুষ-খেকোয় পরিণত হয়েছে, নাওয়া-খাওয়া ফেলে ছায়ার মতো আমি তার পেছনে পেছনে অনুসরণ করেছি। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমার, কেম্মামানে থাকাকালীন আমি বেশি মানুষ-খেকো বাঘকে গুলি করে মারতে পারিনি। পরের অধ্যায়ে আমি আপনাদের অত্যন্ত সুচতুর

ছুটো মানুষ-খেকো বাঘের কাহিনী শোনাবো—কেমাসেক আর জেরান-গাউর মানুষ-খেকো বাঘের কাহিনী। তার আগে স্পষ্ট করে বলে রাখি—মানুষ-খেকোয় পরিণত না হলে, কিংবা গরু বাছুর মেরে গৃহস্থালীর তেমন কোন ক্ষতি না করলে আমি সাধারণত বাঘ মারার আদৌ পক্ষপাতী নই। কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, যখনই ভাবি সারা শরীর আমার আতঙ্কে শিরশির করে ওঠে—অতর্কিতে কোন বাঘ যখন নিরস্ত্র অসহায় কোন মানুষের ওপর হঠাৎ করেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন ঠিক সেই মুহূর্তে আতঙ্কে, বিহ্বল বিস্ময়ে, দুঃসহ যন্ত্রণায় মুমূর্ষু মানুষটা কি ভাবে!
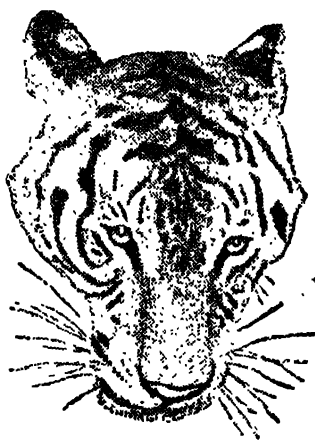
কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটা প্রথম মানুষ মারে ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে, ১২ই সেপ্টেম্বরে। লোকটা ছিল একজন চীনা রবার-সংগ্রহকারী, তার কথা আমি আগেই বলেছি। দুর্ভাগ্যবশত বাঘটা তাকে বেশি দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেনি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা—মানুষ সম্পর্কে ভয়টা তখনও তার সম্পূর্ণ ঘোচেনি। তাই লোকজনের সাড়াশব্দ পেতেই কাছের একটা ঝোপের মধ্যে শিকারকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। লোকটা কয়েকদিন বেঁচে ছিলো, পরে অবশ্য ক্ষতস্থানে পচন ধরার ফলে হাসপাতালে মারা যায়। এই ঘটনার ঠিক এক বছর বাদে দ্বিতীয় মানুষ মারে ১৯৫০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বরে। সেও একজন চীনা রবার সংগ্রহ-কারী, যাকে মারার পর খানিকটা খেয়ে বাকিটা ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার আগে পর্যন্ত ভেবেছিলুম বোধ হয় অল্প আহত হয়ে কিংবা অন্যকোন অসুবিধের জন্যে স্বাভাবিক ভাবে বনের পশু মারার সুযোগ না পেয়েই হয়তো কেমাসেকের বাঘটা মানুষ-খেকোয় পরিণত হয়েছে। না হলে ওর বিচরণক্ষেত্রের প্রায় সবটাই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছোট ছোট রবার-জঙ্গলে আকীর্ণ। বাগিচায় পূর্ণ, এবং ঘন তার ওপর স্থানীয় রবার-সংগ্রহকারীরা ভোর হতে না হতেই মাথায়- বাঁধার ছোট ছোট লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়ে জঙ্গলের পথে। ফলে পথেই হোক কিংবা বাগিচার ভেতরেই হোক—কেমাসেকের বাঘটার পক্ষে ওদের আক্রমণ করা এমন একটা কিছুই কঠিন ছিলো না। অবশ্য মানুষ সম্পর্কে তার অহেতুক ভয়টা কমে যাবার পর এইসব দুর্লভ সুযোগের সে পূর্ণ সদ্-ব্যবহার করেছিলো। তৃতীয় মানুষটা মেরেছিলো সাতান্নদিন পরে, ১৯৫০ সালের ২৫শে নভেম্বরে।

কেমাসেকের নর-খাদকটার মারা মানুষের তালিকা রাখতে গিয়ে একটা ইঙ্গিতপূর্ণ জিনিস আমার নজরে পড়েছিলো, মোট যে তেরোজন

মানুষকে মেরেছিলো তার সবকটাকেই সে মেরেছিলো মাসের দ্বিতীয়ার্ধে, আরও স্পষ্ট ভাবে বলতে গেলে আঠারো থেকে উনত্রিশ তারিখের মধ্যে। নিচের তালিকা দেখলে বোঝা যাবে মাসের প্রথমার্ধে সে কোন মানুষকে মারার চেষ্টাই করেনি।

তারিখ	শিকার	স্থান
১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯	চীনা	তেলোক বাটু
২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০	চীনা	পণ্ডক লিমাউ
২৫শে নভেম্বর ১৯৫০	চীনা	বুটিক তাকাল
২৭শে জানুয়ারি ১৯৫১	চীনা	পণ্ডক লিমাউ
২৩শে মে ১৯৫১	মালয়ী	কাম্পংগ তেবুয়ান
১৮ই জুন ১৯৫১	চীনা মহিলা	পেয়াও
২০শে জুন ১৯৫১	মালয়ী মহিলা	ইবোক
২১শে জুন ১৯৫১	চীনা	বুটিক তাকাল
২৭শে জুন ১৯৫১	মালয়ী	গেলুগর
১৮ই জুলাই ১৯৫১	মালয়ী	বেলেতেক
২১শে জুলাই ১৯৫১	চীনা	বুটিক স্তংগকাল
২৫শে জুলাই ১৯৫১	চীনা মহিলা	পেয়াও
২৭শে জুলাই ১৯৫১	মালয়ী	তুম্পাৎ

প্রথম আক্রমণের অক্ষম প্রচেষ্টার কথা বাদ দিলে, ওপরের তালিকা থেকে তারিখ ছাড়া আরও দুটো ভারি মজার জিনিস অবশ্যই চোখে পড়বে। প্রথম, যদি মানচিত্রের ওপর দুটো শিকারের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত একটা সরলরেখা টানা যায়, তাহলে দূরত্বের পরিমাপ দশ মাইলের কমবই বেশি হবে না। দ্বিতীয়ত, দুটো শিকার মারার মধ্যবর্তী সময়ের একটা হিসেব নিলে বোঝা যাবে, মানুষ ছাড়াও প্রয়োজনমত সে যথেষ্ট বনের পশুও মেরেছে। নইলে তো সে খিদেয় মরেই যেতো। এমন কি ১৮ই জুন থেকে ২৭শে জুলাইয়ের মধ্যে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে আটজন মানুষের ভবলীলা সঙ্গে করে দেওয়া সত্ত্বেও একুশদিন সে কোনো মানু-

ষের রক্তের স্বাদই পায়নি। নিশ্চয়ই এই একুশদিন তাকে অন্যকোন পশু মেরে খেয়ে বাঁচতে হয়েছে।

এটা কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট—সামান্য একফালি জঙ্গল আর রবার-বাগিচা নিয়ে যতটা পরিধি, একটা স্বাধীন বাঘের পক্ষে তা হাস্যকর রকমের সীমিত। আবার অন্যদিক থেকে এটাও ঠিক—তার দৈনন্দিন খিদে মেটা-নোর জন্যে কেবলমাত্র মানুষের ওপর নির্ভর করলেই চলবে না।

আর মাসের শেষের দিকে মানুষ মারার অদ্ভুত আচরণের আমি যুক্তিসংগত কোন কারণ খুঁজে পাইনি। মানুষ-খেকো বাঘের সম্পর্কে এমন কথা এর আগে আমি আর কখনও শুনিনি। তবু এ ক্ষেত্রে কোন কারণ অবশ্যই আছে, এবং আমি তাকে খুঁজে বার করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু যুক্তিসংগত কারণ বলতে যা বোঝায় তা আমি সত্যিই খুঁজে পাইনি। তবে একটা সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছে যেটা হয়তো এ প্রসঙ্গে খুব একটা অযৌক্তিক হবে না। বাঘকে সাধারণত তার দেহের গন্ধ যাতে শিকারের নাকে না পৌঁছায় এমন দূরত্ব এবং সজাগ কান ও তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টির ওপর কড়া নজর রেখেই শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। আমার ধারণা কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটা কোন কারণে চোখে সামান্য কম দেখতো, এবং মাসের শেষের দিকগুলোয় কৃষ্ণ-পক্ষের জন্যে চাঁদের আলো প্রায় পেতোই না। ফলে স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্য-স্থির করে সে বনের পশুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো না। তখন অসহ্য খিদের জ্বালায় লুকিয়ে-চুরিয়ে দিনের বেলায় সে মানুষ মারতে বাধ্য হতো। সেইটেই ছিলো তার পক্ষে সবচেয়ে সহজ, এবং পারিপার্শ্বিকতাও ছিলো তার সম্পূর্ণ অনুকূলে। নিহত ব্যক্তি বা ব্যক্তিনীরা সবাই ছিলো রবার-সংগ্রহকারী। এমনি ভাবে একের পর এক মানুষ মেরে রবার-বাগিচাগুলোয় সে ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করে চলেছিলো।

মারা যাবার পর কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটার মৃতদেহ আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পেয়েছিলুম। বাঘিনী নয়, বাঘ। আমার মারা মানুষ-খেকোর মধ্যে এইটে আর জেরানগাউর নর-খাদকটাই ছিলো কেবল বাঘ, অন্যগুলো সব বাঘিনী। মাত্র আট ফুট

লম্বা, দাঁতের অবস্থাও খুব ভালো—পড়েনি, নড়েনি বা নষ্টও হয়নি। ছাল ছাড়ানোর পর বুকের দিকের পাঁজরায় ছররা-গুলির সামান্য আঘাত লক্ষ্য করেছিলুম। আঘাত ততদিনে প্রায় মিলিয়ে এসেছে, ওপরের চামড়ারও বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। জেরানগাউর মানুষ-খেকো তো দূরের কথা, স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক বাঘের তুলনায় কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটার চেহারা আশ্চর্য রকমের জীর্ণ-শীর্ণ, কেমন যেন ক্ষীণজীব ধরনের। ওজনও হালকা। দেখলে কে বলবে এই শয়তানটাই তেরজন মানুষকে শেষ করে দিয়েছে। ছাল ছাড়ানোর পর শরীরে মেদ বলতে কিছুই ছিলো না। ঠিক জানি না, হয়তো ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যেই সে স্বাভাবিক ভাবে বনের পশু না মেরে মানুষ মারতে প্রবৃত্ত হয়েছিলো। তাছাড়া মানুষ মারার পর খুব বেশি দূরে সে টেনে নিয়ে যেতে পারতো না বা একেবারে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে সবটা খেতেও পারতো না। মানুষের মতো ব্যাঘ্র-সমাজেও যে এমন একটা রোগজীর্ণ অবস্থা থাকতে পারে, একে না দেখলে এ সম্পর্কে হয়তো কোন ভাবনাই আমার কোন দিন কাজ করতো না।

পরীক্ষা করার সময় চোখের মণিদুটোয় বারবার টর্চের আলো ফেলে দেখেছিলুম। কিন্তু আমি তো আর ডাক্তার নই যে ওপর থেকে মৃত কোন বাঘের চোখ দেখে কিছু বুঝতে পারবো। ফলে আমার নিতান্তই ভাসমান অনুমানটাকে সত্যে পরিণত করার কোন অবকাশ পাইনি। পেয়েছিলুম মৃত বাঘের পেটে তিনটে ভারি অদ্ভুত জিনিস :

১. ঘাই-হরিণের বেশ খানিকটা লোম।

২. রবারফলের খোসার আধখানা।

৩. রাং-ঝালাই করা একজোড়া লোহার মাকড়ি।

যদিও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়া উচিত নয়, তবু না হয় হরিণের খানিকটা লোম বাঘের পেটে কোনরকমে বা চলেও যেতে পারে। কিন্তু রবারফলের খোসা বা লোহার মাকড়ি দুটোর ব্যাপারটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকলো না। তবে এর সম্ভাব্য একটাই কারণ হতে পারে, চোখে সে সত্যই কম দেখতো। রবারফলের খোসাটা খাবার সময় মাংসের সাথে

মিশে, মাকড়িজোড়াটা চোখে দেখতে না পেয়ে হঠাৎ করেই তার পেটে চলে গিয়েছিলো।

কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটা ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরে যখন তেলোক বাটুর রবার-বাগিচায় প্রথম মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন অন্যান্য কর্মীরা সব সতর্ক হয়ে যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে খুঁজতে শুরু করে। যে চীনা ভদ্রলোক রবার-বাগিচাটা ইজারা নিয়েছিলেন, তিনি আমার কাছে ছুটে এলেন সাহায্যের জন্যে। আমি তখন তাঁকে একটা বাছুর কিনে রাখতে বললুম। বললুম পরের দিন সকালে আমি আর পা মাৎ গিয়ে তাঁর বাগিচার পরিচালক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবো।

পরের দিন সকালে আমরা পরিচালকের সঙ্গে দেখা করে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় কোথায় কিভাবে বাছুরটা বেঁধে রাখতে হবে বুঝিয়ে দিলুম। এবং এ-ও ওকে বেশ জোর দিয়েই বললুম বাঘটা সম্ভবত আট-দশ দিন কি বারো দিনের মধ্যে নাও আসতে পারে, কিন্তু ও যেন প্রতিটা নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করে যায়। লোকটা যে ভাবে বোদ্ধার মতো ঘাড় নাড়লো, তাতে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা খটকা লাগলো। আমি তখন পা মাৎকে মালয়ী ভাষায় ওকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে বললুম। নিজের কানে শুনলুম পা মাৎ ওকে বলছে, 'তুয়ান' (হুজুর) যা বললেন, সবকটাই খুব দরকারী। একটাও ভুলবেন না বা অবহেলা করবেন না। দু-একদিনের মধ্যে বাঘটা ফিরে না এলেও বাছুরটাকে যেন কোনদিন সন্ধ্যেবেলায় এই গাছটার গায়ে বেঁধে রাখতে ভুলবেন না। আমার মনে হয় তুয়ান ঠিকই বলেছেন, সপ্তাখানেকের মধ্যে বাঘটা হয়তো বাগিচার ধারে কাছে নাও ঘেঁষতে পারে।

অথচ আশ্চর্য, বোকা হাঁদাটাকে পাখি পড়ার মতো এত করে বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও মাত্র দিন তিনেকের জন্যে বাছুরটাকে সে গাছের গায়ে বেঁধে রেখেছিলো। তারপর বাঘটা আর ফিরে আসবে না ভেবে বাড়ির পেছন

দিকে জড়ো করে রাখা এক গাদা কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে সে বাছুরটাকে বেঁধে রেখে দিয়েছিলো। এইটেই হয়েছিলো তার সবচেয়ে বড় বোকামি। ঠিক এগারো দিন পর রাত্তিরে ওই পথ দিয়েই ফেরার সময় বাঘটা খুব সহজেই বাছুরটাকে আবিষ্কার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করে। কিন্তু যতবারই সে শিকারটাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ততবারই পর পর সাজানো কাঠের গুঁড়িগুলো ওপর থেকে হুড়দাড় শব্দে মাটিতে গড়িয়ে পড়তে থাকে। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাছুরটা বাঁধা থাকলে বাঘ অনায়াসেই দড়ি ছিঁড়ে তাকে নিয়ে চলে যেতে পারতো। কিন্তু এরকম বিশ্রী একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে বাঘটা স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ওদিকে ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং কাঠের গুঁড়ি গড়িয়ে পড়ার শব্দে পরিচালক ভদ্রলোক জেগে উঠে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, যে জিনিসটা করতে আমি ওকে বারবার মানা করে দিয়েছিলুম। চেঁচামেচির শব্দে মারা বাছুরটাকে সেখানে ফেলেই বাঘটা পালিয়ে যায়।

পরের দিন সকালে খবর পেয়ে গিয়ে যা দেখলুম তাতে তো আমার চক্ষু স্থির। সত্যিই মূর্খামির একটা সীমা থাকে। এত করে বলা সত্ত্বেও ও আমার কোন নির্দেশই পালন করেনি। আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরে ও যদি বাছুরটাকে গাছের গায়ে বেঁধে রাখতো বাঘ অনায়াসেই দড়ি ছিঁড়ে শিকারটাকে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারতো। পায়ের ছাপ এবং শিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখে আমি মরা বাছুরটাকে নিশ্চয় আবিষ্কার করতে পারতুম। তখন পরের দিন রাত্তিরে মারা-শিকারের কাছে আবার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় আমি ওত পেতে থাকতে পারতুম। অথচ আমার সমস্ত পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ করে দিলো। তবু সুদীর্ঘ অনিদ্র রাত্রি আমি অতিবাহিত করেছিলুম বাগিচার আশে পাশে। একবার খুব কাছেই তার ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন সে আর বাগিচার ধারে-কাছেও ঘেঁষেনি।

মাস খানেক পরে ঠিক একই জায়গায় অন্য একটা গরুকে বেঁধে রেখেছিলুম, বাঘটা তাকে দেখতেও পেয়েছিলো। কিন্তু সম্ভবত পেট ভরা থাকায় গরুটাকে মারার কোন রকম চেষ্টাই করেনি। রাইফেলের দূরত্বের

অনেক বাইরে থেকে অলস ভঙ্গিতে কেবল একটা হাই তুলে গুটি গুটি পায়ে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছিলো।

এর পরে যখন কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটা যেসব অঞ্চলে ঘন ঘন মানুষ মারতে শুরু করলো, সেইসব অঞ্চলে কমিউনিস্ট সন্ত্রাসবাদী-দের প্রচণ্ড দাপট থাকায় আমি আদৌ তাকে নিয়মিত অনুসরণ করতে পারিনি, এমন কি বহু অঞ্চলে ঢুকতেও সাহস পাইনি। ফলে কেমাসেকের মানুষ-খেকোটাকে জ্যান্তো শিকারের লোভ দেখিয়ে ফাঁদ পেতে ধরার চেষ্টা ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় ছিলো না। শুধু এক-আধবার নয়, রীতিমত খরচ করে চার-চারবার তার জন্যে ফাঁদ পাততে হয়েছিলো। কিন্তু কেবল সন্ত্রাসবাদীদের ভয়েই নয়, স্থানীয় অধিবাসীরাও আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। ওদের ধারণা—একটা নয়, দু-ছুটো মানুষ-খেকো বাঘ নাকি সারাটা অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব বিস্তার করে চলেছে। শেষবারের মতো শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো খাঁচার মধ্যে বাঘটা যখন ধরা পড়লো, আমি তখন তাকে খাঁচার মধ্যেই গুলি করে মেরে-ছিলুম। পায়ের থাবা দেখে বুঝেছিলুম এটা মানুষ-খেকো। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ছুটো মানুষ-খেকো বাঘের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে ধারণা ছিলো সেটা যে কত ভুল তা প্রমাণিত হয়ে গেলো ১৭ই আগস্টে কেমা-সেকের মানুষ-খেকো বাঘটা মারা যাবার পর। কেননা তারপর আর কেমাসেকে মানুষ মারার কোন খবর আমার কানে এসে পৌঁছয়নি।

পৌঁছলো অন্য ছুটো মানুষ-খেকো বাঘের খবর। তাও আবার অত্যন্ত ভাসা ভাসা ভাবে। ত্রেনগান্থর একেবারে উত্তরপ্রান্তে ওরা যখন উপদ্রব সৃষ্টি করে চলেছে, আমি তখন ব্যস্ত ছিলুম কেমাসেকের মানুষ-খেকো বাঘটাকে ফাঁদ পেতে ধরার কাজে। সবে যখন ওদের কিছু সাহায্য করা যায় কিনা ভাবছি, তারবার্তায় খবর এসে পৌঁছুলো বাঘছুটোকে মারা হয়েছে। ছুটোই বাঘ এবং প্রায় একই অঞ্চলে মানুষ মারতে শুরু করেছিলো। সচরাচর এমনটা কখনও ঘটে না। মানুষ-খেকো বাঘটার একটাকে সরাসরি গুলি করে মারা হয়েছিলো, অন্যটা কেবল আহত হয়েছিলো। পরের দিন সকালে একদল মালয়ী যখন আহত বাঘটাকে

খুঁজে পেলো, দেখলো বাঘটা তখনও বেঁচে রয়েছে। চকিতে আহত বাঘটা অনুসন্ধানকারীদের একজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সৌভাগ্যবশত মালয়ীটা একটা শেকড়ে পা বেঁধে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে যায়। তার পড়ে যাওয়ার ঘটনাটা এমনই আকস্মিক যে বাঘটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে সম্পূর্ণ উল্টে যায়। এবং পড়বি তো পড় বেশ গভীর একটা গর্তের মধ্যে! তার এই বেকায়দায় পড়ে যাওয়ার সুযোগটা মালয়ী অনুসন্ধানকারীরা হেলায় হারায়নি। রীতিমত বলিষ্ঠতার সাথে ওরা আহত হিংস্র শার্দূলটার মোকাবিলা করেছিলো।

সাত / জেরানগাউর মানুষ-খেকো

হুনগান শহর থেকে প্রায় মাইল পনেরো ভেতরে হুনগান নদীর অন্য পারে ছোট একটা গ্রাম জেরানগাউ। মোহনার দিকে এগিয়ে গেলে মাইল তিনেকের দূরত্ব রেখে প্রায় একই সমান্তরালে—জেরানগাউ, কাম্পংগ উআউ, আরাকাম্পংগ মানচিস, ছোট ছোট তিনটে গ্রাম। এখানকার লোকেদের একমাত্র উপজীবিকা রবারচাষ। এই তিনটে গ্রামের আশেপাশের জঙ্গলকে কেন্দ্র করেই ১৯৫০ সালের শেষের দিক থেকে শুরু করে ১৯৫১ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জেরানগাউর দুর্ধর্ষ একটা মানুষ-খেকো বাঘ দিনের পর দিন তার আতঙ্কের সাম্রাজ্যকে বিস্তীর্ণ করে চলেছিলো।

হুনগান থেকে জেরানগাউতে পৌঁছতে গেলে তিনটে উপায়েপৌঁছনো যায়। প্রথমত নদীপথে। নৌকায় অনেক সময় লাগে। কিন্তু মোটর লঞ্চে গেলে সময় লাগবে সাড়ে তিন ঘণ্টা, অবশ্য বালির চড়ায় যদি না আটকে যায় কিংবা জলে-ডোবা ভারি বড় বড় কাঠের গুঁড়ির গায়ে ধাক্কা খেয়ে যদি না মোটর লঞ্চটার কোন ক্ষতি হয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে অন্যদুটো পথে সময় বাঁচানো যায় প্রায় ঘণ্টা আধেক। দুটো পথেই দুদিক থেকে হুনগান নদীর ধার ধার ছোট দুটো রেলপথ এসে পৌঁচেছে পাদাং পুলুট নামে একটা লৌহ-খনি অঞ্চলে। পাদাং পুলুট পর্যন্ত ট্রেনে এসে শালতি বেয়ে পৌঁছনো যায় নদীর ঠিক অন্য পারে কাম্পংগ মান-চিসে। নাহলে পায়ে হেঁটে নদী পেরিয়ে মাইল ছয়েক রবারের জঙ্গল পাড়ি দিয়ে পৌঁছনো যায় জেরানগাউতে। ঘুরপথ হলেও আমার ব্যক্তি-গত ধারণা পাদাং পুলুট থেকে পায়ে হেঁটে জেরানগাউতে পৌঁছনোই অনেক সহজ, অন্তত সময় লাগে কম। কিন্তু রীতিমত দলে ভারি না হলে এতটা পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একা একা যেতে কেউ সাহস করে না।

তুনগানের দক্ষিণ সড়ক ধরে কেমাসেকে আমার ডেরায় এসে পৌঁছুতে গেলে পাকা তিন ঘণ্টার পথ। অর্থাৎ জেরানগাউতে বাঘে কোন মানুষ মারলে কেমাসেকে খবর পাবার পর সেখানে পৌঁছতে গেলে আমার সবচেয়ে কম করেও সময় লাগবে ছঘণ্টা। তার ওপর কোথাও কোন মানুষ মারার পর জেরানগাউতেই যদি খবর এসে পৌঁছুতে দেরি হয় তাহলে তো আর কোন কথাই নেই। খবর পাবার অন্য আর একটা উপায় আছে—জেরানগাউ থেকে ছ মাইল পথ ঠেঙিয়ে কেউ যদি পাদাং পুলুটে এসে আমাকে টেলিফোন করে। তাও তুনগান থেকে কেমাসেকে আমার কাছে খবর পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় আটঘণ্টার ধাক্কা। অর্থাৎ মানুষ মারার পর বাঘের পায়ের ছাপ আর শিকার টেনে-নিয়ে-যাবার চিহ্ন দেখে মানুষ-খেকো বাঘটাকে তখন খুঁজে বার করা প্রায় দুঃসাধ্য, তার ওপর এক পশলা বৃষ্টি হলে তো হয়েই গেলো।

জেরানগাউর মানুষ-খেকো বাঘের মারা প্রথম শিকারের খবর আমি কিছু পাইনি। দ্বিতীয় শিকারের খবরটাও পেয়েছিলুম অনেক দেরিতে, ব্যক্তিগতভাবে তখন আমার কিছুই করার ছিলো না। ১৯৫০ সালের বারই জুলাইতে জেরানগাউ আর কাম্পংগ উআউ-এর মাঝামাঝি একটা জায়গায় তুনগান নদীর ধারে যে দ্বিতীয় ব্যক্তিটাকে বাঘে মারে সে ছিলো একজন মালয়ী। স্থানীয় লোকেদের ধারণা দুটো বাঘ মৃতদেহ-টাকে খেয়েছে, কেননা মৃতদেহের কাছে বালির ওপরে ছোট বড় দু সারি বাঘের পায়ের ছাপ ছিলো। আসলে ওরা বুঝতেই পারেনি কোন কোন বাঘের পেছনের পায়ের থাবা বেশ ছোট হয়। অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এর আগে একই বাঘের রেখে-যাওয়া সারিসারি পায়ের ছাপ দেখে আমি অনেককে ঠিক একই ভুল করতে দেখেছি। যদিও এমন ঘটনা খুবই বিরল, তবু আমি জোর করে বলতে চাই না, হয়তো হতেও পারে সেবারের মৃতদেহটাকে দুটো বাঘে খেয়েছিলো। কিন্তু আমি যতটা জানি পরবর্তীকালে জেরানগাউর মানুষ-খেকো বাঘটা যতগুলো মানুষ মেরে-ছিলো তার সবগুলো সে একাই খেয়েছিলো।

ওপরে যে মালয়ীটার কথা বলছিলুম, সেদিন সে কাম্পংগ উআউ

থেকে জেরানগাউতে গিয়েছিলো কুটুমবাড়িতে দেখা করতে। কিন্তু ফিরে আসার মাঝপথেই সে আক্রান্ত হয়। অথচ তিনদিন কেউ কোন খবর পায়নি। বউ ভেবেছে কোন কারণে ও বুঝি কুটুমবাড়িতে আটকে পড়েছে, জেরানগাউ থেকে ফিরতেই পারেনি, আর কুটুমবাড়ির লোকেরা ভেবেছে ও নিশ্চয় কাম্পংগ উআউতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তিনদিন হলো মানুষটাকে ফিরতে না দেখে বউএর টনক নড়লো, পাশের বাড়ির লোকজনদের সে খবরটা জানালো। তখন খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেলো। পড়লে আর কি হবে, যা হবার অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তবু অনুসন্ধানকারীর দলটা খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে তার ছোট ছুরিটা খুঁজে পেলো। বালিতে মানুষের আর বাঘের পায়ের ছাপও খুঁজে পেতে তাদের কোন অসুবিধে হলো না! রীতিমত বেশ বড় পায়ের থাবা। ধস্তাধস্তিতে ছোট বড় অনেকগুলো থাবার চিহ্ন দেখে সম্ভবত ওরা গুলিয়ে ফেলেছিলো, না হলে একই সাথে দুটো বাঘের আক্রমণের ঘটনাকে ওদের প্রাধান্য দেওয়ার কোন কারণই ছিলো না। যাই হোক, পায়ের ছাপ দেখে তো অনুসরণ করতে করতে প্রায় দুশো গজ দূরে উত্তর পাড়ের জঙ্গলে নিহত মালয়ীর রক্তে-ভেজা নীল কুর্তাটা ওরা খুঁজে পেলো, কিন্তু সামান্য কিছু হাড়গোড় ছাড়া অবশিষ্টাংশ বলতে তখন আর মানুষটার কোন চিহ্নই ছিলো না। তবু ওরা যাকে খুঁজছে নিহত লোকটা যে সে-ই, সে সম্পর্কে তাদের সন্দেহের কোন অবকাশই রইলো না।

পরে এই ঘটনার খুটিনাটি বিবরণ পেয়েছিলুম জেরানগাউর পেঙ্গুলুর কাছ থেকে। এমনকি সে এ-ও বললো—অনুসন্ধানকারীরা মৃতের হাড়-গোড় নিয়ে যে পথে গ্রামে ফিরে গিয়েছিলো, জেরানগাউর মানুষ-খেকো বাঘটাও নাকি সে দিন রাত্তিরে সেই পথ অনুসরণ করে কাম্পংগ উআউ পর্যন্ত এসেছিলো। হ্যাঁ, ঘটনাটা মিথ্যে না হবার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। কেননা আমি জানি, মানুষ-খেকো বাঘের এরকম বিশ্রী একটা পৈশাচিক অভ্যেস আছে—নিজের মারা শিকারকে কেউ কোথাও সরিয়ে বা তুলে নিয়ে গেলে তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করা। তাছাড়া এমনও হতে পারে, খাওয়ার পর মৃতদেহের অবশিষ্টাংশের গোর দেওয়ার

নৈতিক দায়িত্ব বাঘের, অন্য কেউ তাকে গোর দেবে এটা তার সহ্য নাও হতে পারে। যাই হোক, পেজ্যলুর ব্যক্তিগত ধারণা বাঘটা হঠাৎ করেই শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তাকে আক্রমণ করেনি, বরং বলা যায় দীর্ঘ দেড় মাইল নিঃশব্দে অনুসরণ করে, তারপর ঝোপ বুঝে নির্জন নদীর বেলায় তাকে একলা পেয়ে সাবাড় করেছে। সব কিছু মন দিয়ে শোনার পর আমি পেজ্যলুকে বললুম গ্রামবাসীরা যেন নিজেদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং কোনমতেই যেন দলছাড়া হয়ে একলা একলা না পথ চলে। প্রথম কয়েকদিন ওরা এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার চেষ্টা করেছিলো, তারপরেই সব ভুলে মেরে দিলো।

দীর্ঘ সাত মাস পর জেরানগাউর মানুষ-খেকোটা আবার তার তৃতীয় শিকার মারলো ১৯৫১ সালের সাতাশে জানুয়ারিতে। এবারের নিহত ব্যক্তি ছিলো একজন মালয়ী রবার-সংগ্রহকারী। একটা পা খাওয়া অবস্থায় তাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো গভীর জঙ্গলের মধ্যে। কিন্তু এবারেও অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো। আমি যখন খবর পেলুম, ঘটনা-স্থলে গিয়ে শিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন অনুসরণ করে বাঘটাকে খুঁজে বার করা আমার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিলো না।

এই ঘটনার ঠিক চারদিন পরে, পয়লা ফেব্রুয়ারির খুব ভোরে জেরান গাউর মানুষ-খেকোটা আবার একটা মানুষ মারলো। সৌভাগ্যবশত আগের দিন রাত্তিরে ওপর-মহলের নির্দেশ অনুসারে একদল পুলিস-বাহিনীর সাথে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিলো কমিউনিস্ট সন্ত্রাস-বাদীদের খুঁজে বার করার জন্যে। তুনগান নদীতে নৌকা করে ফেরার পথে দুপুরের আগেই এসে পৌঁছলুম কাম্পংগ উআউতে। নামার কোন পরিকল্পনাই ছিলো না, কিন্তু হঠাৎ দেখলুম একদল লোক জটলা করছে নদীর ধারে। প্রথমে ভেবেছিলুম শুক্রবারে নামাজ পড়ার জন্যে ওরা বোধ হয় সমবেত হয়েছে, কিন্তু কি ভেবে ঘাটে নৌকা ভেড়াতে বললুম।

পাড়ে নামার পর ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলুম, মনে মনে ভাবলুম এ যাত্রায় নিশ্চয়ই বাঘটাকে অনুসরণ করার সুযোগ পাবো। কিন্তু কাছে এগিয়ে গিয়ে শুনলাম আসলে মৃতদেহটাকে যারা বয়ে আনতে গেছে এরা তাদের ফিরে আসার প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নাঃ, কোন লাভ নেই। আর কয়েক ঘণ্টা আগে, অর্থাৎ মৃতদেহটা তুলে আনার আগে যদি একবার দেখতে পেতুম! তবু কেমন যেন মনে হলো বাঘটা খুব শিগগিরি আবার মানুষ মারবে, এবং ঠিক সময়ে খবর পেলে নিশ্চয়ই তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারা যাবে। কাম্পংগ উআউ গ্রামের পেজ্যলুকে ডেকে খুব কড়া করে ধমক ধামক দিয়ে নির্দেশ দিলুম এবার বাঘে কোন মানুষ মারলে সে যেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করে এবং নিজে যেন কড়া নজর রাখে যাতে কোনমতেই মৃতদেহটাকে সরানো না হয়। আমার সঙ্গী ডুনগান পুলিস বিভাগের অধিকর্তা এইচ. কে. ব্যাচেলরও স্থানীয় মালয়ী আর চীনাদের খুব করে কড়কে দিলেন, জেরানগাউর পুলিশফাঁড়িতেও একজন চৌকিদার পাঠিয়ে আমার নির্দেশটাকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করলেন। ব্যাচের সাহায্য পেলে হয়তো আর কয়েকদিনের মধ্যেই জেরানগাউর মানুষ-খেকো শয়তানটাকে শায়েস্তা করা সম্ভব হতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ঘটনার কয়েক মাস পরে অতর্কিতে তিনি কমিউনিস্ট সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন।

মাস খানেক কেটে গেলো, জেরানগাউর আশেপাশের গ্রাম থেকে কোথাও কোন খবর পেলুম না। শেষে সাতুই মার্চে খবর এসে পৌঁছুলো নরখাদকটা তার পঞ্চম শিকার মেরেছে জেরানগাউর কাছে। এবারের নিহত ব্যক্তিও একজন মালয়ী রবার-সংগ্রহকারী। আমি তখন ছিলুম ডুনগানে, খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটর বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ভাবলুম এবারে নিশ্চয় মৃতদেহটা সরিয়ে নেওয়ার আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছুতে পারবো। কিন্তু সবে অর্ধেক পথ এসেছি, হঠাৎ দেখি কি উল্টো দিক থেকে আর একটা মোটর বোট আসছে। কি ব্যাপার? জিগেস করে জানতে পারলুম মোটর বোটে করে মৃতদেহটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া

হচ্ছে। যাই হোক, এবার অন্তত নিজে চোখে মৃতদেহটা দেখার সুযোগ হলো। বাঘের চিরপরিচিত পদ্ধতিতেই পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ঘাড় কামড়ে ধরে তাকে মারা হয়েছে। ঘাড়ের নিচের ক্ষতচিহ্ন দেখে বুঝতে পারলুম মানুষ-খেকো বাঘটার নিচের পাটির ডান দিকের শ্বদাঁতটা হয় নেই না হয়তো ভেঙে গেছে।

এখন আর কিছুই করার নেই। তবু মৃতের রক্তমাখা জামাকাপড় এক পাশে পড়ে থাকতে দেখে হঠাৎ একটা বুদ্ধি আমার মাথায় খেলে গেলো। যদিও খুব কম করেও পঞ্চাশ ষাটজন মৃতদেহ-অনুসন্ধানকারীর পায়ের ছাপের মধ্যে থেকে বাঘের পায়ের সুস্পষ্ট ছাপ খুঁজে বার করা সুদূর-পরাহত, তবু ক্ষীণ একটা আশা বুকে নিয়ে আমি জেরানগাউতে এসে পৌঁছলুম। চোখ কান খোলা রেখে অনেক কিছু আমাকে জানতে হবে দেখতে হবে শুনতে হবে। পায়ের ছাপ থেকে সবার আগে বুঝতে হবে নরখাদকটা বাঘ না বাঘিনী। তাই প্রথমেই আমি বললুম বাঘ যেখানে প্রথম শিকার মেরেছে সেই জায়গাটা আমাকে দেখিয়ে দিতে। সেখানে এসে দেখলুম অজস্র মানুষের পায়ের চিহ্ন, পায়ে পায়ে নতুন একটা পথেরই সৃষ্টি হয়ে চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। অসীম ধৈর্য ধরে চারদিক যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার চেষ্টা করছি, স্থানীয় লোকেরা বারবার করে আমাকে বলতে লাগলো, 'আপনি যেখানে খুঁজছেন সেখানে নয় তুয়ান, বাঘটা এই পথ দিয়েই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমি কিন্তু সেখানে বাঘের পায়ের ছাপের কোন চিহ্নই খুঁজে পেলুম না।

যাই হোক, দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর মোটামুটিভাবে এইটুকু জানতে পারলুম—জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে রবার-বাগিচার সীমানা পর্যন্ত এসে মালয়ীটাকে দেখে বাঘটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। রবার-সংগ্রহের কাজ তখন তার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, শুধু গাছের গায়ে আটকানো পাত্র থেকে তরল রবারটুকু যা ঢেলে নিতেই বাকি। সম্ভবত স্থির নিশ্চল ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর সারি সারি গাছের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে বাঘটা নিঃশব্দে তার শিকারের খুব কাছাকাছি এগিয়ে আসে। উপড়ে-পড়া একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে

নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে আরও খানিকক্ষণ সে অপেক্ষা করে থাকে। তারপর অসাবধানী মানুষটা তরল রবারটুকু সংগ্রহ করে নিয়ে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে, অমনি হিংস্র শার্দূলটা পেছন থেকে হঠাৎ তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে। চকিতে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ অরণ্যের বুক চিরে হারিয়ে যায় বাতাসে।

এসব ক্ষেত্রে বাঘের নিঃশব্দ পদচারণা, গায়ের গন্ধ আড়াল করে রাখার ক্ষমতা এবং অবিশ্বাস্য গতিতে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গি ভাষায় প্রকাশ করা কোনদিনই সম্ভব নয়, অন্তত আমার মতো অসাহিত্যিকের পক্ষে তো নয়ই। উপড়ে-পড়া গাছের গুঁড়ির ওপারে বাঘের পেছনের পায়ের গভীর ছাপ দেখে আমি বুঝেছিলুম বাঘটা এখান থেকেই পেছনের পায়ের ওপর ভর রেখে শিকারের ওপর বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তারপর সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এখানে ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা সহকর্মীদের নাকের ডগা দিয়েই রবার-বাগিচা পেরিয়ে সে মানুষটাকে নিয়ে প্রবেশ করেছিলো জঙ্গলের মধ্যে। না, স্বচক্ষে দেখেছে এমন কথা কেউ আমাকে জানায়নি, তবে পাশের সঙ্গী মানুষের অন্তিম আর্তনাদ আর বাঘের ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জন নিজে কানে শুনেছিলো। সে-ই প্রথম উদ্যোগী হয়ে সংকেতে সবাইকে খবরটা পাঠায়। কিন্তু হলে কি হবে, বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আমি যা খুঁজতে চেয়েছিলুম তার প্রায় কিছুই পাইনি। আসলে আমি বাঘের পায়ের স্পষ্ট কোন চিহ্নই খুঁজে পাইনি।

যাইহোক, শিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন ধরে ধরে এসে পৌঁছলুম জঙ্গলের প্রায় শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে আবার শিকারটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রায় মাইলখানেক ভেতরে একটা জলার ধারে। জায়গাটা ভারি বিদকুটে। আধো আলো-আঁধারিতে দিনের বেলাতেই গা ছমছম করে। জল যা আছে তার চেয়ে বেশি হাঁটু অব্দি প্যাচ-

প্যাচে কাদা আর ঘন আগাছায় সমস্ত জলাটাই প্রায় ভরা। এর আশে পাশে মাচা বাঁধার মতো সুবিধেজনক কোন জায়গাই খুঁজে পেলুম না। তবু জলার মধ্যে খানিকটা নেমে গিয়ে চারদিকটা একবার খুঁজে দেখলুম, কোথাও কিছু পেলুম না। উঠে আসার সময় শক্ত মাটিতে একজায়গায় দেখলুম স্পষ্ট তিনটে পায়ের ছাপ। বুঝতে আমার কোন অসুবিধে হলো না এটা বাঘিনী নয়, পূর্ণবয়স্ক একটা বাঘ। সামনের পায়ের থাবা দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড়, পেছনের পায়ের থাবা দুটো কেমন যেন একটু ছুঁচোলো, অর্থাৎ অনেকটা ত্রিকোণের মতো দেখতে, যা সাধারণত হয় না। এমন অদ্ভুত পায়ের ছাপ কোথাও আর-একবার দেখলে আমি নিশ্চয়ই তাকে চিনতে পারবো। জলা ছেড়ে যে পথে মৃতদেহটাকে জেরানগাউতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই পথ ধরে এগিয়ে চললুম আর দুপাশের গাছপালার ওপর নজর রাখতে লাগলুম, রাত্তিরে বাঘটাকে গুলি করে মারার মতো সুবিধেজনক কোন জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় কি না দেখার জন্যে।

রবার গাছ এমনই পত্র-বিরল যে তাতে মাচা বেঁধে নিজেকে আত্ম-গোপন করে রাখা আদৌ সম্ভব নয়। তাই অন্ধকারে দূরের পথ স্পষ্ট দেখতে না পাবার যথেষ্ট অসুবিধে সত্ত্বেও বাধ্য হয়েই আমাকে একটা ঝাঁকড়া গাছ বেছে নিতে হলো। পা মাংকে মাচা বাঁধার নির্দেশ দিয়ে আমি লোকটার রক্তমাখা জামা-কাপড়গুলো আনতে গেলুম। তারপর শুকনো ডালপালা দিয়ে ঘাসের মণ্ড পাকিয়ে তার গায়ে রক্তমাখা জামা-কাপড় জড়িয়ে নকল একটা মানুষের মৃতদেহ বানিয়ে খানিকটা তফাতে একটা গাছের নিচে সাজিয়ে রাখলুম। কেননা মানুষখেকো বাঘের স্বভাব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সে যদি মৃতদেহটাকে কোথায় বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনুসন্ধান করতে আসে, তাহলে অবশ্যই তাকে এই পথ দিয়ে যেতে হবে, এবং সে যদি মুহূর্তের জন্যেও মৃতের জামাকাপড় শুঁকে দেখার চেষ্টা করে তাহলে আমি তাকে গুলি করে মারার অন্তত একবার সুযোগ পাবো।

বেলাশেষের সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগে আমি মাচায় উঠে জাঁকিয়ে বসলুম, আপৎকালীন জরুরী অবস্থার

জন্তে সঙ্গে আসা রক্ষীবাহিনীর সাথে পা মাৎকে পাঠিয়ে দিলুম জেরান-গাউতে। ওদের বললুম ফিরে যাওয়ার পথে বেশ হৈ-হল্লা করতে করতে ওরা যেন ফিরে যায়, যাতে বাঘ যদি আশেপাশে কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে তাহলে ওদের চেঁচামেচির শব্দ শুনে বুঝতে পারবে আমরা সবাই ফিরে গেছি। কেননা আর কেউ না জানুক আমি অন্তত জানি বাঘ কি অসম্ভব রকমের চালাক, প্রকৃতির সঙ্গে যথাযথভাবে না মিললে সন্দেহ সে করবেই। ওরা ফিরে যাবার পর যতটা সম্ভব কোনরকম নড়া-চড়া না করে টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর সব হাতে হাতে গুছিয়ে নিলুম। বলা যায় না, বাঘটা হয়তো কোন ঝোপের আড়াল থেকে আমার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, বেশি নড়াচড়ায় সতর্ক হয়ে যেতে পারে। মাচার ওপর সেই যে জাঁকিয়ে বসলুম তারপর থেকে রাত নটা অব্দি আর কোন টুঁ শব্দটি করিনি।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন জানি-আমার এক স্বল্প পরিচিত বন্ধুর কথা মনে পড়লো, শিকারে যাবার সময় সঙ্গে নেবার জন্তে যিনি বহুবার আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কিছুটা উন্নাসিক ভঙ্গির জন্তে আমি তেমন করে কোনদিনই কান দিইনি। সম্ভবত বাঘ-ছালের লোভে একবার তিনি নিজেই বাঘ শিকারে উত্তোগী হলেন। হৃষ্টপুষ্ট একটা বাছুর কিনে, রীতিমত কসরত করে মাচা বেঁধে, তার ওপর আরাম কুর্সি চাপিয়ে বাবু মৌজে শিকারে বসলেন। আঁধার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে ঘণ্টা তুয়েক খোস-গল্পও চালালেন। বন্ধুরা বিদায় নেবার পর ফ্লাস্ক থেকে গরম এক পেয়ালা কফি ঢেলে সিগারেট ধরালেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো, রাত গভীর হলো, এক সময়ে পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদও ঢলে পড়লো অরণ্যচূড়ার আড়ালে, কিন্তু বাঘ আর এলো না। পরের দিন ভোরে মাচার নিচেটা আমি পরীক্ষা করে দেখেছিলুম। বাছুরটা যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছিলো তার থেকে গজ পনেরো তফাতে দেখেছিলুম একটা বাঘিনীর সত্ত পায়ের ছাপ, আর মাচার নিচে থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম পঁচিশটা সিগারেটের টুকরো।

সিগারেট তো দূরের কথা, রঙিন জামা-কাপড় বা উগ্র গন্ধ কোন

প্রসাধন, এমনকি সামান্যতম নড়াচড়ার শব্দেও বাঘ সতর্ক হয়ে যেতে পারে।

নড়াচড়া বা কোন রকমের শব্দ না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্জন অরণ্যে চুপচাপ একা একা বসে থাকাটা সত্যিই এক অগ্নিপরীক্ষা। মনে আছে একবার সন্ধ্যের আগে থেকে একটা বাঘিনীর জন্যে পথের ধারের ঝোপের মধ্যে মাচা বেঁধে চুপচাপ বসে আছি, দেখলুম একদল জেলে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা করতে করতে হঠাৎ পথের ধারে বাঘে মারা মোষটাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, এদিক ওদিক চারদিকে তাকালো, অথচ আমার ওপর কারুর নজরই পড়লো না। নিজের এই অনড় স্থবিরতায় সত্যিই খুব খুশি হয়েছিলুম, তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলুম এর দুঘণ্টা পরে গজ পনেরো দূরের একটা ঝোপ থেকে বাঘিনীটাকে নিঃসংকোচে বেরিয়ে আসতে দেখে। আসলে আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে বাঘিনীটাও কিছু টের পায়নি, আর পায়নি বলেই সে যাত্রায় আমি তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে মারার সুযোগ পেয়েছিলুম।

হ্যাঁ, তারপর যে কথা বললুম, সেই যে গুছিয়ে বসলুম রাত নটা অব্দি আর কোনরকম টুঁ শব্দটি করিনি, আর বাঘটারও কোনরকম সাড়াশব্দ শুনিনি। নটার পর হঠাৎ অন্ধকারে আমার দিকে এগিয়ে আসা ওর পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। যদিও শুকনো পাতার ওপর বেশ সতর্ক পায়ের শব্দ, তবু একটা ব্যাপারে আমি অন্তত নিশ্চিন্ত হলুম—আমার অস্তিত্ব ও টের পায়নি, না হলে এই সামান্যতম শব্দটুকুও আমার কানে আসার কথা নয়।

কিন্তু আমার ধারণা অনুযায়ী বাঘটা প্রথমে আসবে জলার ধারে যেখানে সে মৃতদেহটাকে ফেলে গিয়েছিলো, তারপর মৃতদেহটাকে সেখানে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে ফিরবে এই পথে। কিন্তু জলার দিক থেকে না ফিরে বাঘটা এলো সম্পূর্ণ উলটো দিক থেকে, অর্থাৎ বাঁদিক থেকে আমার পেছন ঘুরে। অত্যন্ত সতর্ক পায়ে ধীরে ধীরে গাছের নিচে দিয়ে আমাকে অতিক্রম করে ও আরও খানিকটা এগিয়ে গেলো, তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে রাইফেলটা আমি এমনভাবে

কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছি যাতে আর এক পা এগুলেই গুলি চালাতে পারি। বাঘটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি টর্চটা জ্বালিয়ে দিলুম।

দেখলুম আমার কল্পনা অনুযায়ী বাঘটা নকল মৃতদেহটার সামনে দাঁড়িয়ে নেই, আমার দিকে পেছন ফিরে সামান্য একটু বাঁদিকে চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে আমি যেখানে বসে রয়েছি সেখান থেকে গাছের একটা ডাল আড়াল পড়ায় ওর মাথা বা কাঁধের কোন অংশই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। চকিতে অত্যন্ত দ্রুত এবং সতর্ক ভঙ্গিতে মোটামুটি কাঁধ আন্দাজ করে গুলি চালালুম। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনের পায়ের ওপর ঘুরে চোখের পলক পড়ার আগেই সে বাঁদিকের জঙ্গলে দীর্ঘ এক লাফ দিলো। ট্রিগার টেপার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলুম গুলিটা কোন মতেই বাঘের গায়ে লাগবে না, লাগা সম্ভব নয়। নরখাদকটার দীর্ঘ আকস্মিক লাফে এবং আমার গুলি চালানোর মধ্যে কোথায় যেন সমাপতনের সুসম একটা ছন্দ রয়েছে।

গুলির শব্দটা নিস্তব্ধ অরণ্যে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাবার পর আমি যেন সম্বিত ফিরে পেলুম, যেন বাঘটার অন্তিম আর্তনাদ শোনার জন্যে এতক্ষণ উদগ্রীব হয়ে ছিলুম। অথচ দুর্লভ একটা মুহূর্তের সুযোগ আমি কি নির্মমভাবে হেলায় হারিয়েছি। ইচ্ছে করলেই আমি অনায়াসেই বাঘটাকে সরাসরি গুলি করে মারতে পারতুম, শুনতে পেতুম বাতাসে কেঁপে কেঁপে গুমরে মরা ওর অন্তিম আর্তনাদ। ব্যর্থতায় আমার নিজেরই মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কোন লাভ নেই। মিনিট দশেক চুপচাপ অপেক্ষা করার পর আমি মাচা থেকে নিচে নেমে এলুম। নিচে নামতে গেলে দুহাত খালি রাখা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলো না। তাই রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলুম, টর্চটা জ্বালিয়ে মুখটা নিচের দিকে করে রাখলুম। কিন্তু সেই প্রথম

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে, নির্জন নিস্তব্ধ অরণ্যের বুকে মাটিতে পা দেবার আগে সারা শরীর আমার ছমছম করে উঠেছিলো, শিরশির করে উঠেছিল বুকের ভেতরটা, যেন কাছে পিঠেই কোথাও হিংস্র নরখাদকটা ওত পেতে রয়েছে আমার জন্যে।

গুলি করার সময় বাঘটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেই জায়গাটা আমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলুম। পায়ের ছাপের খুব কাছেই দেখলুম মাটিতে গুলির গর্ত। গর্তের মধ্যে বা তার আশেপাশে কোথাও রক্তের দাগ, গায়ের লোম বা হাড়ের টুকরো কিছু পাইনি। পায়ের ছাপ ধরে বেশ খানিকটা পথ অনুসরণ করেও কোথাও কোন রক্তের দাগ দেখিনি। হঠাৎ করেই মনে হলো, জেরানগাউর মানুষ-খেকো বাঘটা যে ধরনের বেপরোয়া, এভাবে অনুসরণ করাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আহত হলে তবু না হয় খানিকটা ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারতো, কিন্তু বেশি দূরে না গিয়ে অন্ধকারে যদি অতর্কিতে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আসলে মনে মনে আমি নিজেকেই খানিকটা দুর্বল করে ফেলেছিলুম। তাই আর দেরি না করে চোখ কান খোলা রেখে গুটি গুটি পায়ে মাচার কাছেই ফিরে এলুম। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালুম। প্রথমে ভেবেছিলুম আপাতত মাচার ওপর উঠবো না। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হলো ঠিক আমার পেছনে যেন বাতাসে পাতার মৃদু মর্মর আর মাটিতে কার অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত ভীরুর মতো আমি আমার মাচার নিরুদ্বিগ্ন আসনেই ফিরে এলুম।

দু'ঘণ্টাও অপেক্ষা করতে হয়নি, তার আগেই পা মাৎ আর রক্ষীবাহিনী ফিরে এলো। জেরানগাউ থেকেই ওরা আমার ম্যানলিকার রাইফেলের গুরু-গম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলো। অনেকগুলো টর্চ জ্বালিয়ে দল বেঁধে রবার-বাগিচার মধ্যে দিয়েই ওরা এসে পৌঁছলো, সঙ্গে মৃত বাঘকে বয়ে নিয়ে যাবার মতো শক্ত পাকানো লাঠি হাতে চারজন স্থানীয় মালয়ী। পা মাৎ নিশ্চয়ই ওদের বলেছে বাঘটা তুয়ানের হাতে মারা পড়েছে! এখন আমি ওদের কি বলবো, কি বলে নিজের মনকেই বা সান্ত্বনা দেবো? দুর্ধর্ষ বেপরোয়া এমন একটা মানুষ-খেকো শার্দূলকে

গুলি করে মারার সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারিয়ে কোন্ লজ্জায় আমি ওদের কাছে মুখ দেখাবো? সত্যি ওদেরকে দেখার পর থেকে আমি যেন আরও মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগলুম। কিন্তু এখন এই ব্যর্থতা ফিরিয়ে নেওয়ার আর কোন উপায় নেই, তাই সেদিন রাত্তিরেই বিষণ্ণ একটা মন নিয়ে ডুনগানে ফিরে এলুম। কেমামানে এসে পৌঁছলুম পরের দিন ভোরবেলায়। একটা জিনিস আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো—এবার থেকে মানুষ মারার পর অন্ধকারে শিকারের কাছে ফিরে আমার সময় মানুষ-খেকোটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে ফিরবে, এবং নকল মৃতদেহের লোভ দেখিয়ে ওকে আর কিছুতেই ভোলানো যাবে না।

এই ব্যর্থতার পর তিনটে গ্রামেরই পেঙ্ঘুলুদের কাছে লিখিত আদেশপত্র পাঠানো হলো যে এবার থেকে আমি না এসে পড়া পর্যন্ত মৃতদেহটাকে যেন কোন মতেই সরানো না হয়। এই নির্দেশনামা পাঠানো হলো পুলিস প্রধানের মাধ্যমে, যিনি গ্রামবাসীদের ব্যাখ্যা করে বোঝালেন কেন এই পন্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, কি ভাবে গ্রাম-বাসীরা এতে উপকৃত হবে। আমি ডুনগান থেকে হৃষ্টপুষ্ট একটা গাভী সংগ্রহ করে মোটর বোটে করে পাঠিয়ে দিলুম জেরানগাউতে। নির্দেশ মত গ্রামবাসীরা দিনের বেলায় গরুটাকে খাওয়াতো চরাতো, আর প্রতিদিন রাত্রিরবেলায় রবার-বাগিচার নির্দিষ্ট একটা জায়গায় বেঁধে রাখতো। বাঘটা কিন্তু তার দিকে সামান্যতম দৃষ্টিপাতও করলো না। এদিকে গ্রামবাসীরা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে, দিনের বেলাতেও কাজে যেতে ভয় পায়। জরুরী অবস্থার তাগিদে সরকারের তরফ থেকে বেশ কিছুসংখ্যক তরুণকে সটগান দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু হলে কি হবে, দিন কুড়ি যেতে না যেতেই নরখাদকটা আবার একজন চীনা রবার-সংগ্রহকারীকে মারলো যেখানে আমি মাচা বেঁধে ধূর্ত শয়তানটাকে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলুম তারই খুব কাছা-

কাছি একটা জায়গায়। প্রায় সন্ধ্যের দিকে খবর পেলুম মৃতদেহটাকে যেখানে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো এখনও সেখানেই পড়ে রয়েছে। পরের দিন খুব ভোরে বেশ হালকা খুশি খুশি একটা মন নিয়ে গিয়ে পৌঁছলুম সেখানে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছেই আতঙ্কে দু চোখের পাতা আমার স্থির হয়ে গেলো। দেখি কি,

ক. মৃতদেহটাকে খানিকটা সরিয়ে পরিষ্কার একটা জায়গায় এনে রাখা হয়েছে, যাতে খুব সহজেই বাঘটাকে গুলি করে মারা যায়।

খ. মৃতদেহটার সারা শরীরে মিশরের মমির মতো কাপড় জড়িয়ে জড়িয়ে প্যাঁচানো হয়েছে।

গ. কাছাকাছি গাছের ডালে বিরাট একটা মাচা বাঁধা হয়েছে এবং সারা রাত জেগে সবাই পাহারা দিয়েছে, যাতে রাতের অন্ধকারে বাঘটা মৃতদেহের ধারেকাছেও না ঘেঁষতে পারে।

শুধু চক্ষু চড়কগাছই নয়, মূর্খমির জন্যে বাঁদরগুলোকে ধরে তখন আমার ঠাস ঠাস করে চড়াতে ইচ্ছে করেছিলো। অথচ আশ্চর্য, ওদের আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না—মানুষ-খেকো বাঘকে গুলি করে মারতে গেলে এর কোনটাই করা উচিত ছিলো না, এবং এভাবে মৃত-শিকারের কাছে ধূর্ত বাঘকে কিছুতেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। ওরা কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করলো না, বরং বাঘ যে ফিরে আসবে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ই প্রকাশ করলো। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ওদের এই সহযোগিতা আমাকে সন্তুষ্ট করতে না পারায় মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে ওরা রীতিমত ক্ষুব্ধই হয়ে রইলো। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তখন আমার কিছুই করার ছিলো না, তবু চব্বিশটা ঘণ্টা একা একাই সেই মাচার ওপর কাটিয়ে দিলুম, যদি বাঘটা ফিরে আসে। আসেনি আসবে না জানতুম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কাছে বা দূরে কোথাও তার সাড়াশব্দও শুনিনি। ভোরে টিটাবু পাখির ডাক শুনে মাচা থেকে নেমে এলুম।

একটা কথা ভাবতেই মনটা আমার ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো—বাঘটাকে মারার যতবারই সুযোগ পেয়েছি, চেষ্টা করেছি, ততবারই

কোন না কোন রকম অপ্রত্যাশিত ত্রুটির জন্যে সমস্ত পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। জেরানগাউর একজন নামকরা ওঝা বেশ জোর দিয়েই আমাকে বললো, 'আট জন মানুষ মেরে কোটা পূর্ণ না করলে বাঘটাকে কিছুতেই মারা যাবে না।' এমন কি হাসতে হাসতে সে এ-ও বললো, 'অবশ্য আপনাকে আগে মেরে বাঘটা যদি না তার কোটা পূর্ণ করতে পারে, তবেই আপনি তাকে গুলি করে মারতে পারবেন তুয়ান।'

সেদিন ওর কথায় আমি কান দিইনি, কেননা বাঘ সম্পর্কে এধরনের অজস্র কুসংস্কার মালয়ীদের আছে। প্রথম প্রথম ওদের এই সংস্কারগুলোকে আমি বাস্তবে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলুম—যেমন বাঘ শিকারে যাবার সময় কোন গিরগিটি ডান দিক থেকে পথ পেরিয়ে বাঁদিকে চলে গেলে সে যাত্রা নাকি শুভ হয়। কিন্তু মালয়ের জঙ্গলে এত অজস্র অগণন গিরগিটি যে শিকারে বেরিয়ে কত গিরগিটিকে আমি পাথের ডানদিক থেকে বাঁদিক, বাঁদিক থেকে ডান দিকে চলে যেতে দেখেছি। কিন্তু শুভ-অশুভ যাচাই করে দেখার কোন অবকাশই পাইনি। অথচ ওঝার কথাটা ভবিষ্যতে যে এমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি।

জেরানগাউর মানুষ-খেকোর সপ্তম শিকার মারা পড়লো ছয়ই এপ্রিলে, কাম্পং মানচিসের দক্ষিণে। সে একজন মালয়ী জেলে, মাছ ধরতে গিয়েছিলো তুনগান নদীর ধারে। সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই তার মৃতদেহটাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিশেষ জরুরী একটা সরকারী কাজে আমাকে যেতে হয়েছিলো কুয়ালালামপুরে, ফিরে এসে খবর পেলুম ঠিক দুদিন পরে। তখন ভেবেছিলুম কি জানি, তাহলে হয়তো মালয়ী ওঝার কথাই ঠিক, আটজন মানুষের কলজের রক্ত পান না করলে হয়তো হিংস্র শার্দুলটাকে শায়েস্তা করা যাবে না।

সপ্তম মানুষ মারার দু-একদিন পরেই জেরানগাউ পুলিস ফাঁড়ি থেকে খানিকটা তফাতে বিরাট একটা মোষকে মারলো অত্যন্ত নিপুণ তৎপরতায়, তারপর চোখের নিমেষে টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেলো জঙ্গলের মধ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনদিনের মধ্যে মৃতদেহটাকে কেউ খুঁজে পায়নি, যখন পেলো, দেখলো দিন দুপুরে খোলামেলা জায়গায় বাঘটা মৌজসে বসে খাচ্ছে। মানুষের পায়ের সাড়া পেতেই অবশিষ্ট দেহটাকে মুখে করে নিয়ে গিয়ে ঢুকলো গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সত্যি, গুলি করে মারার এমন দুর্লভ সুযোগ শিকারীদের জীবনে বড় একটা আসে না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সবে যখন একটু বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করছি তখন দুনগানে আমার কাছে এই খবর এসে পৌঁছলো। সঙ্গে সঙ্গে পা মাংকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ছোট রেলপথ ধরে বিকেল চারটে নাগাদ এসে পৌঁছলুম পাদাং পুলুটে। খেয়া পেরিয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ে হেঁটে-পাড়ি-দেওয়া আগেকার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে কাম্পং মানচিস থেকে জেরানগাউতে আমরা এসে পৌঁছলুম খুবই তাড়াতাড়ি। কিন্তু বাঘে মারা শিকারটাকে খুঁজে বার করতে সেই সন্ধ্যে হয়ে গেলো। বাঘের পায়ের ছাপ দেখে বুঝলুম এটা সেই জেরানগাউরই মানুষ-খেকো। সমস্ত জলা জায়গাটা এমন বিশ্রী হাঁটু অব্দি প্যাচপ্যাচে কাদা আর মশায় ভর্তি যে ভাবতেই গা ঘিনঘিন করে। কিন্তু তখন অতশত ভাব-বার অবকাশ নেই, হাতে সময়ও খুব অল্প, যা করার এখনই ঠিক করতে হবে। আশেপাশে মাচা বাঁধার মতো শক্ত কোন গাছ না থাকায় পা মাংকে একটা ঝোপের আড়ালে মাটির ওপরে খোঁটা পুঁতেই মাচা বাঁধতে বললুম।

স্থানীয় দুজন মালয়ীর সাহায্যে মাচা বাঁধার কাজ শেষ করতে করতে আঁধার ঘনিয়ে এলো। তারপর নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে সম্পূর্ণ একা রেখে পা মাং ওদের দুজনকে নিয়ে ফিরে গেলো। নিঃসঙ্গ সেই অন্ধকার রাতে নড়বড়ে মাচার ওপরে বসে কেন জানি আমার কেবলই মনে হতে লাগলো—শব্দ শুনে ব্যাটা নিশ্চয়ই কোন ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে

আমাদের কাণ্ডকারখানা সব লক্ষ্য করছে, এবং শিকারের আশা ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে দূরে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। সময় অনুযায়ী যদিও এত তাড়াতাড়ি তার আসার কথা নয়, তবু কেবলই মনে হতে লাগলো —আসবে না, আসবে না, কিছুতেই সে আসতে পারে না। মানসিক অস্থিরতা সত্ত্বেও দীর্ঘ কয়েকটা ঘণ্টা কেটে গেলো। সাড়ে নটা নাগাদ মনে হলো যেন তার মৃদু পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। হ্যাঁ, ঠিক তাই! কিন্তু শেষবারের চেয়ে আরও অনেক বেশি সতর্ক হয়ে, যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে খুব ধীরে ধীরে আরও খানিকটা এগিয়ে এলো, আমার মাচা থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে মিনিট খানেক ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর আবার ফিরে গেলো। আমার আসনটা এমন ঘন পত্রপল্লবে ঢাকা যে আমি জানি ঘুরে গুলিকরা কোন মতেই সম্ভব নয়। নড়াচড়ার সামান্যতম একটু শব্দতেই বাঘ সতর্ক হয়ে যাবে, তখন আর দ্বিতীয় বারের জন্যে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

মানুষ-খেকো বাঘটার ফিরে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে এই ধারণাই আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেলো যে আমাদের মাচাবাঁধার শব্দ শুনে ও নিশ্চয়ই কিছু একটা সন্দেহ করে নিয়েছিলো, না হলে এত সতর্কতার কোন কারণই ছিলো না। আর তা যদি সত্যি হয়, মৃত মোষটার কাছে আবার তার ফিরে আসার কোন প্রশ্নই আসে না। তবু মনে মনে ঠিক করলুম ভোর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। বরাবরের মতো এবারেও রাইফেলের মুখটাকে মাচার সামনে পোঁতা শক্ত একটা লাঠির ওপর রেখে দিয়েছি, আর আমি নিজে বেশ আয়েশ করে বাবু-হয়ে বসে হাঁটুর ওপর হাত রেখে প্রতীক্ষা করছি। রাইফেলের পেছনটা রয়েছে আমার কোলের কাছে, যাতে প্রয়োজনের সময়ে কোনরকম শব্দ না করেই আমি অনায়াসে গুলি চালাতে পারি।

নিশুত রাত্রি জুড়ে ঝিঁঝির ডাক, রাত-জাগা পাখির ডানার ঝাপট, নাম-না-জানা অজস্র পতঙ্গের সব অদ্ভুত আওয়াজ, পাতা খসার মৃদু শব্দ আর অরণ্যের বিচিত্র সুরমূর্ছনা শুনতে শুনতে আরও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক নিঃশব্দে কেটে গেলো। আড় চোখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম

মাঝরাত্রি। আকাশে ক্ষীণ চাঁদ উঠেছে, ঝিরঝিরে মিষ্টি একটা বাতাস বইছে। হঠাৎ মনে হলো পেছনে জলার দিক থেকে খুব অস্পষ্ট কি যেন একটা শব্দ আসছে, যেন নিঃশব্দে জল ভেঙে খুব ধীরে ধীরে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, আমার আকাঙ্ক্ষিত সেই অরণ্যের সম্রাট, নিঃশব্দে ঠিক আমারই পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চল পাথরের প্রতি-মূর্তির মতো দু-এক মিনিট অপেক্ষা করার পর আরও খানিকটা সামনে এগিয়ে এলো, ঠিক আমার পায়ের নিচে, তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ভয়ঙ্কর এই মুহূর্তটার কথা ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে কোন-দিনই সম্ভব নয়, মাটি থেকে মাত্র আট ফুট উঁচুতে নড়বড়ে চারটে খোঁটার ওপর বাঁধা অপলকা একটা মাচার ওপরে আমি বসে রয়েছি, আর অসম্ভব ধূর্ত হিংস্র শাদূর্লটা দাঁড়িয়ে রয়েছে একেবারে আমার পায়ের নিচে। রাইফেলটাও এখন আমার হাতে নেই। আর থাকলেও, সত্যিকরে আমি যদি ওটাকে গুলি করে মারার আশা রাখতুম, তাহলে ওই অবস্থাতে কোনমতেই আমার পক্ষে গুলি চালানো সম্ভব হতো না। রাইফেলটা তোলার সামান্যতম একটু শব্দেই ও সতর্ক হয়ে যেতো। তাই কোথাও কোনরকম সাড়াশব্দ না করে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করেই আমি চুপচাপ স্থির হয়ে রইলুম।

স্থির হয়ে রইলুম আমরা দুজনেই। বুঝতে পারছি না আমার ওপর ও বেশি উৎসাহী, না মরা মোষটার ওপর? তখনও পর্যন্ত জানি না মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়ে পেছনের পায়ের ওপর ভর রেখে আমার ওপর সোজা লাফিয়ে পড়বে কি না। ঠিক এমনি ভাবে মিনিট তিনেক, যদিও আমার কাছে তখন মনে হয়েছিলো পনেরো মিনিট কি তার চেয়েও বেশি, অপেক্ষা করে থাকার পর বাঘটা অত্যন্ত সন্তর্পণে গুড়ি মেরে খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো মরা মোষটার দিকে। অর্থাৎ আমার মাচা থেকে আরও খানিকটা সামনের দিকে। ঠিক একই সতর্কতায় আমিও আন্দাজে রাইফেলটাকে স্পর্শ করলুম, অত্যন্ত সন্তর্পণে সেটাকে তুলতে শুরু করলুম কাঁধের ওপর। পায়ের নিচে থেকে বাঘটা সামান্য একটু তফাতে

সরে যাওয়ায় মনে মনে খুশি হলুম, ভাবলুম সরাসরি টর্চের আলো জ্বেলেই ঝট করে গুলি চালাবো। বাঘটা যখন আমার এত কাছে তখন নিশ্চয়ই নিশানা ব্যর্থ হবে না। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে নড়াচড়ার শব্দ শুনে বাঘের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারছি না। টর্চটা না জ্বালা পর্যন্ত অন্ধকারে স্পষ্ট করে কিছু দেখতেও পাবো না।

ধীরে ধীরে মানুষ-খেকোটা সামনের দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে এলো। ধীরে ধীরে আমিও ম্যানলিকারটাকে কাঁধের ওপর তুলে নিলুম। আপ্রাণ চেষ্টা করলুম তীক্ষ্ণ নজর চালিয়ে কিছু দেখার, কিন্তু পেলুম না। হঠাৎ করেই বাঘটা এমন অদ্ভুত একটা কাণ্ড করলো যা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। অনেকটা দুঃখ পেলে মানুষ যে ভাবে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অনেকটা সেই ভাবে বাতাসে বেশ বড় গোছের একটা শ্বাস নিয়ে বাঘটা আনাড়ির মতো এক লাফ মারলো। ওর এই আকস্মিক আচরণে পরে মনে হয়েছিলো ঘাড় ঘুরিয়ে সম্ভবত ও আকাশের পটভূমিতে আমার ন্যাড়া মাচাটাকে দেখতে পেয়েছিলো। কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি এমন কোন শব্দ করিনি যাতে ও সতর্ক হয়ে উঠেছিলো।

লাফ বলতে যা বোঝায় এটা কিন্তু সে রকম নয়, বরং বলা যায় দু পা পেছু হটে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লো ডান দিকের ঝোপের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে আমার টর্চের আলোও গিয়ে পড়লো সেখানে, বসে বসেই দু-একবার এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না। আর সেই মুহূর্তে বসা অবস্থা থেকে চকিতে ওরকম নড়বড়ে একটা মাচার ওপর উঠে দাঁড়ানোর মতো সহজ অবস্থা আমার ছিলো না। সন্তর্পণে যখন উঠে দাঁড়ালুম, বাঘ তখন আলোর বৃত্তের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছে। হঠাৎ এমন হুড়মুড় করে ঝোপের মধ্যে না পড়ে ও যদি পেছনের পায়ে ভর রেখে সামনের দিকেও লাফ দিতো, অসম্ভব গতি সত্ত্বেও আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারতুম। নাকের ডগা থেকে চোখে ধুলো দিয়ে বাঘটা এভাবে পালিয়ে যাবে আমি সত্যিই ভাবিনি। হতাশায় ব্যর্থতায় আমার কান্না পেয়ে গেলো। দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে নতুন করে পাওয়া আঘাতটাকে আমি সামলে

নেবার চেষ্টা করলুম। আর ঠিক তখনই অজস্র প্রশ্ন একসাথে ভিড় করে এলো আমার মনের মধ্যে—এটা করা উচিত ছিলো, ওটা করা ঠিক হয়নি। তীব্র মানসিক অনুশোচনায় আমার নিজেরই নিজেকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে হলো। জেরানগাউর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রবারবাগিচার লোক-জনদের কাছে আমি এখন কি কৈফিয়ত দেবো? তার চেয়ে বড় কথা, এমন সুবর্ণ সুযোগ হারাবার পর কেমন করে আমি কোন মানুষ-খেকো বাঘকে গুলি করে মারার স্বপ্ন দেখবো। পুবের আকাশ রাঙিয়ে সূর্য ওঠার আভাস দেখে আমি মাথা নিচু করে গ্রামের পথে ফিরে চললুম।

এই ঘটনার বেশ কয়েক দিনের মধ্যে নতুন করে আর কোন খবর পাইনি। স্থানীয় লোকেদের ধারণা ছু ছুবার অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে জেরানগাউর মানুষ-খেকো দূরে কোথাও সরে গেছে, অর্থাৎ আমিই তাকে তাড়িয়ে ছেড়েছি। কথা হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু খবর পেলুম জেরানগাউ থেকে ছ মাইল দূরে কাম্পংগ মানচিসে তেইশে এপ্রিলে বাঘটা আবার একটি মালয়ী রবার-সংগ্রহকারীকে হত্যা করেছে। মানুষ-টাকে সে হত্যা করেছে সকাল দশটা নাগাদ। পরে আমি এমনও শুনে-ছিলুম যে সেদিন ভোরবেলায় তুনগান নদী পেরিয়ে তাকে নাকি কাম্পংগ আউর দিকে যেতে দেখা গিয়েছিলো। এবারের আক্রমণের ঘটনাটা সত্যিই তুঃসাহসী। আগে যাদেরকেই আক্রমণ করেছিলো সবাই ছিলো একা, কিংবা একা হবার সুযোগের প্রতীক্ষায়। কিন্তু এবারে যাকে আক্রমণ করেছিলো, সে তার অন্য এক জন সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছিলো রবার-বাগিচার একবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘটা তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেলো জঙ্গলের মধ্যে। ঘটনার তীব্র আকস্মিকতায় এবং ভয়াবহ পরিণতির চরম মানসিকতায় পাশের মালয়ীটা ঘণ্টা আটেক কোন কথাই বলতে পারেনি।

খুব স্বাভাবিক, অরণ্যের বুক চিরে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জনে হিংস্র একটা বাঘ অবিশ্বাস্য গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তার পাশেরই একজন সঙ্গী-কে টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে চলে যাবে, আর সে দুঃসাহসীর মতো অবিচল ভঙ্গিতে একা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে, পৃথিবীতে এমন মানুষ খুব কমই আছে। এই তো, এই ঘটনার ঠিক কয়েক সপ্তাহ পরে খুব কাছাকাছির ঘন ঝোপের আড়াল থেকে অন্য একটা মানুষ-খেকো বাঘিনী হঠাৎ এমন ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর গর্জনে আমাকে ভয় দেখিয়ে-ছিলো যে হাতে রীতিমত দামী রাইফেল থাকা সত্ত্বেও আমার আত্মা-রাম খাঁচা ছাড়ার জোগাড় হয়েছিলো।

কেন জানি না, এই অষ্টম হত্যাকাণ্ডের খবর যখন আমার কাছে এসে পৌঁছলো তখন বিকেল চারটে। তুনগানের সদর দফতর থেকে আমাকে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গেই পা মাৎকে নিয়ে কেমামান থেকে বেরিয়ে পড়লুম কাম্পংগ মানচিসের উদ্দেশ্যে। বাড়তি জামা কাপড়, প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্তর সব আমার গাড়িতেই সাজানো থাকে। কিন্তু যত তাড়াতাড়িই করি না কেন, খুব ভালো করেই জানি রাতের আগে আর কিছুতেই কাম্পংগ মানচিসে পৌঁছুতে পারবো না। তাই খুব বেশি একটা তাড়াহুড়ো করলুম না। তাছাড়া ব্যাচের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাদাং পুলুট থেকে রক্ষীবাহিনী সাহায্য করতে আসবে পরের দিন ভোরবেলায়।

নদী পেরিয়ে পরের দিন সকালে আমরা যখন কাম্পংগ মানচিসে এসে পৌঁছলুম, দেখলুম সন্ত্রাসবাদী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কড়া পুলিস-প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বাহিনীর নেতৃত্ব করছেন আমার পূর্ব-পরিচিত একজন সার্জেন্ট। নির্দেশ অনুযায়ী তিনি আমাকে যেখানে খুশি যাবার এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিলেন। স্পষ্টই বুঝতে পার-লুম গণ্ডা তিনেক পুলিস সঙ্গে নিয়ে বাঘ শিকারের কোন আশা নেই, তাও আবার জেরানগাউর মতো সবচেয়ে ধূর্ত বাঘ। বাধ্য হয়ে আপোস করতে হলো, ঠিক হলো আমার সঙ্গে কেবলমাত্র একজন মালয়ী চৌকি-দার আসবে, সে অবশ্য স্বেচ্ছায় এই কাজ করতে রাজি হয়েছিলো। তার

আসল কাজ হবে পা মাৎএর সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করা এবং প্রয়োজন বোধে জঙ্গলের মধ্যে আমাকে একা রেখে পা মাৎএর সঙ্গে ফিরে আসা।

কিন্তু যাত্রার শুরুতেই যে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলো তাতে আর একজন মালয়ীকে সঙ্গে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় রইলো না। পা মাৎ-এর কাছে বহনযোগ্য মাচার তক্তা, দড়াদড়ি এবং নানান প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বেশ বড় বড় কয়েকটা বোঝা থাকায় বেচারি তার নিজের সটগানটা চালাবার কোন সুযোগই পেতো না। আর আপৎকালীন জরুরী অবস্থায় জঙ্গলের মধ্যে নিরস্ত্র হয়ে চলাটাও নিতান্ত মূর্খামি। তাই ভাগাভাগি করে মালপত্তর বওয়ার জন্যে বেছে বেছে একজন বুড়ো মালয়ী চৌকিদারকে সঙ্গে নিলুম। মুখে না বললেও আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম চারজনের নিতান্ত এই ক্ষুদ্র দলটা ভারপ্রাপ্ত পুলিস সার্জেন্টকে আদৌ খুশি করতে পারেনি। পারার কথাও নয়, কিন্তু এ ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় ছিলো না। যেখানে রবার সংগ্রহকারীটাকে হত্যা করা হয়েছিলো, কাম্পংগ মাচিস ছেড়ে প্রথমে আমরা সেই জায়গাটার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লুম। নির্দিষ্ট ঘটনাস্থলটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে পথ থেকে তুজন রবার-সংগ্রহকারীকেও জুটিয়ে নিলুম। কিন্তু জায়গাটার মোটামুটি একটা হদিশ দিয়ে সেই যে তারা কেটে পড়লো, তারপর তাদের আর কোন টিকিই দেখিনি।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করে আমরা যে রবার-বাগিচাটায় এসে পড়লুম, সেটা কেমন যেন চৌকনো মতন দেখতে। সারিসারি রবার গাছে ঘেরা তার দক্ষিণ কোণটা এসে পৌঁছেছে মানচিস নদীর একেবারে কোল পর্যন্ত। নদীটা এখান থেকে খুব বেশি হলে গজ পাঁচেক দূরে। নিহত ব্যক্তি এখানেই তার সঙ্গীর সঙ্গে নির্যাস সংগ্রহ করছিলো। পনেরো ফুট চওড়া নদী পেরিয়ে আসার সময় দূর থেকে ওরা তুজনে অবশ্যই বাঘটাকে দেখতে পেয়েছিলো। কেননা নদী পেরিয়ে বাঁদিকের বালিয়াড়ি ভেঙেই বাঘটা দক্ষিণ দিক দিয়ে বাগিচায় এসে ঢুকেছিলো। এবং গাছের গায়ে রবার সংগ্রহের গর্তটা দেখে আমার

বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি ওরা দুজন নদীর দিকে মুখ করেই কাজ করছিলো। যদিও বাঘটা আরও খানিকটা ঘুরে পেছন থেকেই লোক-টার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, তবু আমার ব্যক্তিগত ধারণা ওরা হয়তো আগেই বুঝতে পেরেছিলো প্রকৃত ঘটনাটা কি ঘটতে যাচ্ছে।

শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সঙ্গীর চোখের সামনে দিয়ে বাগি-চাটা আড়াআড়ি ভাবে ঘুরে বাঘটা যেদিক থেকে এসেছিলো নদী পেরিয়ে আবার সেই দিকেই চলে গেছে। শিকার টেনে নিয়ে চলার চিহ্ন ধরে আমরা সেই পথেই এগিয়ে চললুম। নদী পেরিয়ে প্রবেশ করলুম আপৎকালীন জরুরী অবস্থার জন্যে নিষিদ্ধ করে দেওয়া একটা জঙ্গলের মধ্যে। শিকার টেনে নিয়ে চলা চিহ্ন ধরে মানুষ-খেকো কোন বাঘকে খুঁজে বার করার এইটেই পদ্ধতি। এ যে কি ভীষণ ক্লান্তিকর কি ভয়ঙ্কর রকমের উদ্বেগজনক অনেকের হয়তো তেমন কোন ধারণাই নেই। চোখ কান খোলা রেখে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অনুসন্ধান করতে হয়, সব সময়েই মনে রাখতে হয় বাঘ নিশ্চয়ই আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে, যে কোন মুহূর্তে একটু অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সঙ্গে কয়েকজন লোক থাকলে যেমন সুবিধে হয়, আনাড়ি লোক থাকলে তেমনি সুবিধের চাইতে অসুবিধেই হয় অনেক বেশি। যত নিঃশব্দেই ওরা চলাফেরা করুক না কেন, ওদের পায়ের শব্দ ছাপিয়ে দূরের জঙ্গলে সামান্যতম নড়াচড়ার শব্দকে অনুমান করে নেওয়া খুব কঠিন। তার ওপর ওদের নিরাপত্তার প্রশ্ন তো আছেই। তবু আপাতত এইটুকু সান্ত্বনা—পা মাৎ ওদের সঙ্গে রয়েছে, আর কিছু না হোক অন্তত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারবে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আমরা সেই আকাঙ্ক্ষিত জায়গাটায় এসে পৌঁছলুম। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলুম এগারোটা পঁচিশ

আর মৃতদেহটা যেন গতকাল থেকে হিংস্র শার্দূলের অসীম কৃপাপার্থী হয়ে প্রায় সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মৃত মানুষটার মুখের দিকে চোখ পড়তেই আমি চমকে উঠলুম. বয়েসে নিতান্তই তরুণ, এমন সুন্দর টুকটুকে গায়ের রঙ সচরাচর মালয়ীদের মধ্যে বড় একটা চোখে পড়ে না। সবচেয়ে অবাক হলুম তার প্রশান্ত স্নিগ্ধ মুখের অভিব্যক্তি দেখে। ঠিক যেন নিটোল সুন্দর একটা স্বপ্নের মধ্যে ও ঘুমিয়ে রয়েছে। এত দিন বইয়েতে পড়েছি ভয়ঙ্কর নৃশংস কোন পরিবেশের মধ্যে মানুষ মারা গেলে, বিশেষ করে খুন করা হলে, তার চোখে মুখে সেই নিষ্ঠুর নৃশংসতার ছাপ ফুটে উঠবেই। কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণা আজ আমার নির্মম ভাবে ভেঙে গেলো, কেননা দেড় ঘণ্টা আগেও আমার ধারণা ছিলো— বাঘ যে আক্রমণ করছে ছেলেটা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলো। সত্যই ও জানতে পেরেছিলো কি না, এই মুহূর্তে ওর মুখ দেখে সুনিশ্চিত ভাবে আমি কিছুই অনুমান করতে পারলুম না।

মৃতদেহটা না ছুঁয়ে ওপর থেকেই পরীক্ষা করে দেখলুম খুব সম্প্রতি বাঘটা এর থেকে খাওয়া শুরু করেছে। খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হলো না আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে ও আড়ালে কোথাও সরে গেছে, বরং স্পষ্টই মনে হলো বাঘ সাধারণত যেমন করে, খাওয়া ফেলে উঠে গিয়ে যেন জল খেতে গেছে। পা মাৎও আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তাই অহেতুক আর সময় নষ্ট না করে দুজনেই খুঁজতে শুরু করলুম কোথায় সুবিধেজনক একটা আশ্রয় পাওয়া যায় যেখান থেকে মানুষ-খেকো বাঘটা ফিরে এলে তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। কিন্তু আশ্চর্য, জঙ্গলের মধ্যে ধারেকাছে সত্যিই এমন উপযুক্ত কোন আশ্রয় খুঁজে পেলুম না যেখানে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের আত্মগোপন করে রাখা যায়। অথচ ভাববার সময় নেই। একবার মনে হচ্ছে বাঘটা এখুনি এসে পড়বে, আবার মনে হচ্ছে—না, সন্ধ্যের আগে সে আর ফিরে আসবে না।

এইসব সাত পাঁচ সমস্যা নিয়ে আমরা যখন এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভাবছি, হঠাৎ বাঁদিকের জঙ্গল থেকে একটা ফেউ কয়েকবার বেশ জোরে জোরে ডেকে উঠলো। চকিতে আমরা সবাই চমকে উঠলুম, বুঝতে

কোন অসুবিধে হলো না বাঘটা এবার তার নিজের পথে ফিরে আসছে। কোন উপায় না দেখে আমি খুব সামনেরই পত্রবিরল একটা তরুণ গাছকে বেছে নিলুম। মৃতদেহটা থেকে প্রায় আট গজ দূরে, মাটি থেকে সাত-ফুট ওপরে দু ডালের মাঝে পাশাপাশি দুটো তক্তাকে কোনরকমে আটকে নিলুম, পা মাৎ দ্রুত হাতে নিচে থেকে একটা দড়ি ছুঁড়ে দিলো। অন্য মালয়ী দুজন খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটা কলাপাতা কেটে আনলো। মাচার সামনে দড়ি দিয়ে বেশ কয়েক পাক বেড়ার মতো করে বেঁধে কলাপাতাগুলো পরপর সাজিয়ে বেশ সুন্দর একটা আড়াল তৈরি করলুম। সামনের একটা কলাপাতা ফুটো করে তার মধ্যে থেকে রাইফেলের নলটা বার করে রাখলুম।

এতক্ষণ আমার প্রায় অশ্রুত চাপা কণ্ঠস্বরের নির্দেশে পা মাৎরা নিঃশব্দে যন্ত্রের মতো কাজ করে যাচ্ছিলো, এবার মোটামুটি সব কাজ সারা হতেই আমি ওদের তিনজনকে রবার-বাগিচায় ফিরে যাবার নির্দেশ দিলুম। এমন কি এও বললুম অত্যন্ত সতর্ক নজর রেখে সশব্দে বেশ দ্রুত পায়েই ওরা যেন ফিরে যায়, এবং এমন একটা ভঙ্গি করে যেন বাঘটা বুঝতে পারে ওরা ভয় পেয়েই ছুটে পালাচ্ছে। তখন সে নিশ্চিন্তে আবার তার শিকারের কাছে ফিরে আসবে। ওদের দুড়দাড় পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে আমি ঘড়ির দিকে তাকালুম—এগারোটা তেতাল্লিশ। আশ্চর্য, পনেরো মিনিটের মধ্যে এতগুলো কাজ একসাথে কেমন করে শেষ করা সম্ভব হলো আমি নিজেই ভেবে পেলুম না। সত্যি, সুস্থির হয়ে ভাববার তখন কোন অবকাশই ছিলো না, বিশেষ করে কাছে পিঠে বাঘের অস্তিত্ব সম্পর্কে যখন আমরা সুনিশ্চিত। আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে বসে রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিলুম। উত্তেজনায় গরমে তখন আমি দরদর করে ঘামছি। কপাল চিবুক বেয়ে টসটস করে ঘামের ফোঁটাগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে হাঁটুর ওপরে, বগল বুক পিঠের কাছের জামা ঘামে ভিজে সপসপ করছে। এতক্ষণে মনে হলো একটু জল খেলে ভালো হতো, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি যেন ফেটে যাচ্ছে।

কি যেন সব আবোলতাবোল ভাবছিলুম, হঠাৎ ফেউটা আবার

জোরে জোরে তুবার ডেকে উঠলো। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হলো আমি যেন রাজকীয় পদচারণার অস্পষ্ট মৃত্ব শব্দ শুনতে পেলুম। বিপুল আনন্দে বুকের ভেতরটা আমার নিঃশব্দে নেচে উঠলো। সতর্ক পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো আমার দিকে। এবার দিনের আলোয় তার মাথাটা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। কিছুটা উদ্বিগ্ন তার পা ফেলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝি মৃতদেহটাকে নতুন কোন জায়গায় নিয়ে যাবার কথা ভাবছে। এমন প্রলুব্ধ ভঙ্গিতে তার মাথাটা সামনের দিকে এগিয়ে রয়েছে, একবার মনে হলো সরাসরি বুলেটের আঘাতে মাথাটা গুঁড়িয়ে দিই, এই একমাত্র সুযোগ। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার মনে হলো পাকা শিকারীদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এসব ক্ষেত্রে মাথায় গুলি করা আদৌ কোন সুনিশ্চিত আঘাত নয়। তাই বাঘ যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃতদেহটা কামড়ে ধরেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার এপাশ থেকে তার ঘাড়টা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অসীম ধৈর্য ধরে আমি চুপচাপ বসে রইলুম। যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই, মুখে করে বাঘ মৃতদেহটা অন্য কোন জায়গাতেই নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। অচিরেই ঠিক গুনে গুনে তিন পা সামনে এগিয়ে এসে সামান্য একটু ঝুঁকে সুদীর্ঘ চোয়াল দিয়ে শিকারের ঘাড় কামড়ে ধরার মুহূর্তে আমি লম্বালম্বি ভাবে মাথা আর কাঁধের মাঝখানে গলার কাছে লক্ষ্য স্থির করে গুলি চালালুম। এমন তুর্লভ জায়গায় গুলি চালানোর সুযোগ শিকারীদের জীবনে বড় একটা আসে না।

প্রচণ্ড গুলির শব্দে সারাটা অরণ্য থরথর করে কেঁপে উঠলো, কেঁপে উঠলো আহত বাঘের ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জনেও। গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা সামনের থাবার ওপর হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো, ব্যর্থ প্রয়াসে পেছনের পায়ের থাবাতুটো কয়েকবার ছুঁড়লো শূন্যে। আর প্রতিবারে তুঃসহ আক্ষেপণের সাথে সাথে শরীরটাকে ঘষড়ে ঘষড়ে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সামান্য একটু পরেই মাথাটা একপাশে ঘুরে গেলো, সামনের থাবাতুটো ছিটকে বেরিয়ে এলো দেহের নিচে থেকে, তারপর থরথর করে সারাটা শরীর একবার কেঁপে চিরদিনের মতো স্থির নিস্পন্দ হয়ে গেলো। চারদিক নিস্তব্ধ নিথর।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম এগারোটা সাতান্নো। আমি জানি পা মাৎরা গুলির শব্দ এতক্ষণে নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে, তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে এবং বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই জানানোর জন্যে আকাশের দিকে রাইফেল তুলে আর-একটা ফাঁকা আওয়াজ করলুম।

মিনিট পনেরোর মধ্যে তরুণ পুলিশ চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে পা মাৎ ফিরে এলো। বুড়ো মালয়ীটাকে না দেখে জিগেস করলুম, 'কি ব্যাপার, বুড়োকে দেখছি না যে?'

'ওকে কাম্পং মানচিসে পাঠিয়েছি তুয়ান, মরা মানুষ আর বাঘ-টাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোকজন জুটিয়ে আনতে। তাছাড়া পুলিস সার্জেন্টকেও একটা খবর পাঠানো দরকার।'

পা মাৎএর দূরদর্শিতায় মনে মনে তারিফ না করে পারলুম না।

গাছের গায়ে হেলান দিয়ে আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরালুম। পা মাৎ বাঘের পা বাঁধাছাঁদার কাজে লেগে পড়লো, সাময়িক মাচাটাও খুলে নেওয়া হলো। বাঘের পায়ের থাবাগুলো দেখলুম, সত্যিই, রীতিমত বড়। নিটোল সুঠাম স্বাস্থ্য। নিচের পাটির ডানদিকের শ্বদাঁতটা দেখলুম খানিক ভাঙা। দুটো কীলকের মধ্যবর্তী স্থানের মাপ নিলুম—আট ফুট ছ ইঞ্চি। মৃত বাঘটাকে জঙ্গল থেকে বাইরে বার করে আনার পর রদ্দুরে তার কয়েকটা ছবিও নিলুম। এখন দুটো চারা গাছের গুঁড়িতে ঝুলন্ত বাঘটাকে দেখলে কে বলবে এইটেই জেরানগাউর সেই হিংস্র নরখাদক, নিপুণ তৎপরতায় যে পর পর আটজন মানুষকে নিঃশব্দে গোরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমার ধারণা ছিলো জেরানগাউর মানুষ-খেকো বাঘের কাহিনী এখানেই শেষ। শেষ হলেও এর জের চলেছিলো দীর্ঘদিন অব্দি। জেরানগাউর মানুষ-খেকো বাঘটাকে গুলি করে মারার দেড় মাস পরে দুনগানের একজন মালয়ী অফিসার ত্রেনগান্নুর সরকারী দফতরে এক

আবেদনপত্র পাঠালেন। মানুষ-খেকো বাঘের স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ, তাকে শিকার করার পদ্ধতি সম্পর্কে কোন কিছু না জেনেই তিনি সেই আবেদনপত্রে অভিযোগ করলেন—আমি নাকি বাঘ শিকারের আনন্দকে উপভোগ করার জন্যে মৃত মালয়ীর দেহটাকে 'টোপ' হিসাবে ব্যবহার করেছি, এবং মুসলমানদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী এটা নিন্দনীয় অপরাধ। প্রথমে এই আবেদনপত্র সম্পর্কে আমি সরাসরি কিছুই জানতে পারিনি, কেউ একজন পড়ে আমাকে জানিয়েছিলো। আবেদন-পত্রের বিষয়বস্তুতে সত্যিই আমি মর্মাহত হয়েছিলুম। কেননা কোন সম্প্রদায়ের ধর্মকে আঘাত করার অভিপ্রায় আমার ছিলো না, বরং পক্ষান্তরে নিজের নানান অসুবিধা সত্ত্বেও পরের উপকারই করতে চেয়ে-ছিলুম। তার ওপর মৃতদেহটাকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে না নেওয়ার অর্থ যদি 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে আমার আর কিছুই বলার নেই।

অনেকের ধারণা ছিলো আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে এই আবেদন-পত্রের বিরোধিতা করবো। না, সে ধরনের কোন মানসিকতা আমার কাজ করেনি। এর কয়েকদিন পরে মালয়ে সর্বোচ্চ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান দফতর থেকে 'মুফতি'র নির্দেশ পেয়েছিলুম—বাঘ শিকারের জন্যে মৃত মানুষকে যেন এভাবে আর কাজে লাগানো না হয়। তখন বাধ্য হয়েই পূর্বাপর সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে সুদীর্ঘ এক চিঠি দিয়েছিলুম, বোঝাতে চেয়েছিলুম এভাবে চেষ্টা না করলে আরও বহু নিরীহ মানুষকে অকালে প্রাণ হারাতে হতো বাঘের হাতে। তাছাড়া দুর্ঘটনায় কোন মানুষের মৃত্যু হলে পুলিসের ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা, কিংবা বাঘে মারা আহত কোন মানুষকে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বা মৃতদেহটাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে দেরি হওয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী যদি আদৌ নিন্দনীয় অপরাধ না হয়, বাঘে মারা মৃতদেহটাকে ঘটনাস্থলে ফেলে রাখাটাই বা কেন নিন্দনীয় অপরাধ হতে যাবে? আর মানুষের প্রয়োজন ছাড়া নিছক আনন্দ উপভোগের জন্যে কোন বাঘকে আমি কোনদিনই গুলি করে

মারিনি, মারাটাকে পছন্দও করি না। শেষ পর্যন্ত এ চিঠির ফলাফল কি দাঁড়িয়েছিলো জানার কোন অবকাশ পাইনি, তার আগেই কেমামান থেকে আমাকে বদলি হয়ে যেতে হয়েছিলো সিঙ্গাপুরে।